গোবর গণেশের গবেষণা

[দ্বিতীয় সংস্করণ]

"And behold she (Commercialism) has three gigantic arms with three torches of universal corruption in her hand. The first torch represents the flame of war, that the beautiful courtesan carries from city to city and country to country. Patriotism answers with flashes of honest flame, but the end is the roar of guns and musketry. The second torch bears the flame of bigotry and hypocrisy. It lights the lamp only in temples and on the altars of sacred institutions. It carries the seed of falsity and fanaticism. It kindles the minds that are still in cradles and follows them to their graves. The third torch is that of the law, that dangerous foundation of all unauthentic traditions, which first does its fatal work in the family, then sweeps through the larger worlds of literature, art and statesmanship."—Tolstoy.

শ্রীহরিদাস হালদার।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

প্রকাশক—শ্রীবনমালী সেনগুপ্ত,
১৭নং টালিগঞ্জ রোড,
কালীঘাট, কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীকুলচন্দ্র দে
শাস্ত্রপ্রচার প্রেস
৫নং ছিদাম মুদির লেন, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

"গোবর গণেশের গবেষণা" প্রকাশিত হইল। ইহাতে কোনও ব্যক্তিবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া কোথাও কিছু লেখা হয় নাই। ইহার মধ্যে ধর্ম্ম, সমাজ, রাষ্ট্র ও নীতি বিষয়ে যেসকল কথা বলা হইয়াছে, তাহার সকলগুলিই যে আমার নিজের মত তাহা নহে।

কালীঘাট
১৩২২ সাল।

শ্রীহরিদাস হালদার।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন

এবারে "প্রেম ও পরিণয়" শীর্ষক পরিচ্ছেদটি যোগ করা হইল। এই প্রবন্ধের অধিকাংশ ইতিপূর্ব্বে "নারায়ণ" মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সংস্করণে গ্রন্থের কোন কোন অংশ ঈষৎ পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে।

১৩২৩ সাল।

শ্রীহরিদাস হালদার।

সূচী।

ভূমিকা

এই গ্রন্থ আমার আত্মজীবনচরিত না হইলেও, আমিই যে ইহার একপ্রকার নায়ক, তাহা এইখানে একটু ইঙ্গিতে বলিয়া রাখা ভাল। নায়ক নায়িকা না হইলে গ্রন্থ রচনা হয় না। আমার নায়িকার একান্ত অভাব। সেকারণে তিলফুলের সহিত তাহার নাসার তুলনা করিতে পারিলাম না। এদুঃখ রাখিবার স্থান নাই। তবে আশা এই, যদি স্বয়ং নায়ক সাজিয়া দাঁড়াইতে পারি, তাহা হইলে একদিন যোগ্যা নায়িকা জুটিলেও জুটিতে পারিবে। এ পদ আর কাহাকেও দিলে নিজের চান্স্ নষ্ট করা হয়। সুতরাং বিনা বন্ধুবর্গের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে আমার এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের নায়কত্ব পদে আমি স্বেচ্ছায় এ অধীনকে বরণ করিতে কুণ্ঠিত হইলাম না।

গ্রন্থারম্ভে নায়িকার অভাবে অন্ততঃ নায়কের কিঞ্চিৎ রূপ-বর্ণনা আবশ্যক। তাহার দুইটি কারণ আছে। প্রথমতঃ, রূপ-বর্ণনারূপ যে প্রচলিত পদ্ধতি আছে তৎপ্রতি সম্মান প্রদর্শন। দ্বিতীয়তঃ, তদ্দ্বারা উপযুক্ত নায়িকা আকৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা; যেহেতু পুরুষের রূপাগ্নিতে রমণীরূপ পতঙ্গের ঝাঁপ দেওয়ার উদাহরণ বিরল নহে। কিন্তু আমার নিজের রূপ নিজে বর্ণনা করিতে লজ্জা করে এবং আশঙ্কা হয় পাছে অতিরঞ্জিত হইয়া পড়ে। এ কার্য্যের ভার আমি কোনও লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকের স্কন্ধে চাপাইবার চেষ্টায় ছিলাম। তিনি এজন্য আমার ফটো চাহিয়া পাঠাইলেন। আমি তাঁহাকে লিখিলাম,—"ফটো তুলিতে বৈদেশিক যন্ত্র-বিজ্ঞানের সাহায্য লাগে; আমি 'স্বদেশী' হইয়া সে সাহায্য

গ্রহণ করিতে পারিব না। তৎপরিবর্ত্তে আমার উৎকৃষ্ট গোবর-গ্রাফ্ পাঠাইতে পারি; তাহাতে চলিবে কি না লিখিবেন।" আমার সাহিত্যিক বন্ধু এপর্য্যন্ত কোন উত্তর দিলেন না। সম-ব্যবসায়ীর ঈর্ষা বড় ভয়ঙ্কর জিনিস। আমি আর কাহাকেও আমার রূপবর্ণনার জন্য তোষামোদ করিলাম না। নিজের এ তুচ্ছ কাজ আমাকে বাধ্য হইয়া নিজেই করিতে হইবে। যদি আমার স্বরূপ চিত্রের কোন স্থানে রঙ্ কিছু অধিক পড়িয়া যায়, তাহা হইলে পাঠকগণ—বিশেষতঃ পাঠিকাগণ অনুগ্রহ করিয়া আপনাদের আবশ্যকমত মুছিয়া লইবেন।

শৈশবে কিঞ্চিৎ লম্বোদর, স্ফীতমস্তক ও শূর্পকর্ণ ছিলাম বলিয়া গুরুজনেরা আমাকে দেখিলেই "গণেশ দাদা পেটটি নাদা" বলিয়া রহস্য করিতেন। সেই অবধি আমার গণেশ নামই বাহাল থাকিয়া গেল। নামটি আমার আকৃতি প্রকৃতি হইতে আপনি ফুটিয়া উঠিয়াছিল; পঞ্জিকা-সমুদ্র মন্থন করিয়া এ পারিজাতের উদ্ধার করিতে হয় নাই। আমার শিরোভাগের পরিধি দেখিয়া পিতা মনে করিয়াছিলেন যে, তন্মধ্যে প্রচুর মগজ ও বুদ্ধির সমাবেশ হইবে। কিন্তু আমার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সে বিশ্বাস কর্পূরবৎ অদৃশ্য হইতে লাগিল। শুকদেব গোস্বামীর ন্যায় আমি অনেকটা অদ্বৈতবাদ লইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলাম। সে কারণে বাল্যকালে বহুদিন যাবৎ হ্রস্ব ই, দীর্ঘ ঈ এবং পূর্ব্ব পশ্চিম বা উত্তর দক্ষিণের ভেদজ্ঞান আমার বোধগম্য হয় নাই। আমার সূক্ষ্ম-বুদ্ধিতে বুঝিয়াছিলাম যে, স্বরবিশেষের উচ্চারণভেদ ও দিগ্বিদিক্ জ্ঞান কেবল মনুষ্যকল্পিত। আমার শিক্ষক মহাশয় একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন। পর্ব্বত যে বহ্নিমান্ তাহা তিনি

ধুমদৃষ্টে দূর হইতে সিদ্ধান্ত করিতে পারিতেন। ফ্রেনলজিতেও তাঁহার যথেষ্ট দখল ছিল। তিনি আমার মস্তক পরীক্ষা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, তাহার মধ্যে গোময়ের অস্তিত্ব আছে। তিনি বলিলেন, পাছে আমার বৃহৎ মস্তকের মধ্যে সূক্ষ্মবুদ্ধি ঢক্ ঢক্ করিয়া নড়ে, এজন্য বিধাতাপুরুষ তন্মধ্যস্থ শূন্যাংশসকল সুলভ পবিত্র দ্রব্যবিশেষের দ্বারা পূরণ করিয়া দিয়াছেন। আমার আত্মীয়বর্গ তাঁহার এই তত্ত্ববাদ সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত সুতরাং অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিলেন। তদবধি আমার নামের পূর্ব্বে 'গোবর' সংজ্ঞা একাগ্রে অশ্বতরীর ন্যায় সংযোজিত হইল। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আমাকে যে চিরদিনের জন্য শ্রীমান্ গোবর গণেশ দেবশর্ম্মা আখ্যায় অভিহিত হইতে হইল, তাহার মৌলিক তত্ত্ব এই।

যাহাদের আকর্ণবিস্তৃত ভাসমান নেত্র, তাহারা জগতের যাবতীয় বস্তুর বহির্দ্দেশমাত্র ভাসা ভাসা রকমে দেখিয়া থাকে। অন্তর্ভেদী তীক্ষ্ণ ও ক্রুবৎ প্যাঁচোয়া দৃষ্টি এরূপ নেত্রে সম্ভবে না। আমিও এরূপ দৃষ্টির পক্ষপাতী নহি। তাই সৃষ্টিকর্ত্তা আমার অভিরুচি বুঝিতে পারিয়া নির্জ্জনে বসিয়া সৃজন করিবার সময় দুইটি রন্ধ্রগত তির্য্যক্ চক্ষু দিয়া আমাকে চিরবাধিত করিয়াছেন। মস্তিষ্কের সান্নিধ্যে অবস্থিত বলিয়া এই চক্ষু দুইটি আমার দর্শন ও গবেষণার যুগপৎ সহায়তা করিত। জগতের সকল বস্তুই আমার চোখে বাঁকা ঠেকে; আমি সংসারের কিছুই ত সরল দেখি না। পাঠক পাঠিকা হয় ত বলিবেন যে আমার চোখের দোষ। আমার মনে হয়, দুনিয়া সয়তানের তৈরী; তাই ইহার সকলই বাঁকা।

বাল্যকাল হইতেই আমার মধ্যে চিন্তাশীলতার লক্ষণ প্রকাশ

পাইয়াছিল। সমবয়স্ক সহপাঠিগণ যখন ছা-ডিগ্‌-ডিগ্‌ খেলিত, আমি তখন দূরে বসিয়া স্বভাবের শোভার মধ্যে কোথায় কি অস্বাভাবিক ও অসঙ্গত আছে, তাহা লইয়া মনের মধ্যে তোলা-পাড়া করিতাম। দৃষ্টিশক্তির অনুসরণ করিয়া আমার চিন্তাশক্তিও নিয়ত বক্রগতি অবলম্বন করিত। যেদিন পদ্যপাঠে পড়িলাম,—

> পিঞ্জরে বসিয়া শুক মুদিয়া নয়ন
> কি ভাবিছ মনে মনে ; অথবা তোমার
> ভাবনার বাস্তবিক আছে অধিকার,—

সেই দিন আমার মনে হইল, আমিও ত একরকম পাখী এই দেহ-পিঞ্জরে বাস করিতেছি, এবং যতদিন খাঁচাছাড়া না হইব, ততদিন আমার ভাবনার অধিকার আছে। অথবা আমার একার কথা বলি কেন? আমরা ত সকলেই পোষাপাখী, হরেকরকম শেখা বুলি কপ্‌চাইয়া থাকি, দাঁড়ে বসিয়া ভিজা ছোলা খাই, মাঝে মাঝে চরণ শৃঙ্খলের মধুর নিক্কণ কান পাতিয়া শুনি, এবং কখন কখন উদাস প্রাণে বনপানে চাহিয়া থাকি। সুতরাং শুক পাখীর মত আমাদেরও ভাবিবার বিষয় আছে।

সেইদিন হইতে আমি বিশেষভাবে ভাবিতে সুরু করিলাম। আমার ভাবনার আদ্যন্তমধ্য কিছুই ঠিক থাকিত না। আমি যাহা কিছু দেখিতাম, তাহা লইয়াই গভীর গবেষণায় নিমগ্ন হইতাম ; এবং সে সময়ে আমার মনে যে সকল খেয়ালের উদয় হইত, তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া ফেলিতাম। আবার সাবকাশমত তাহা সকলকে আগ্রহ সহকারে পড়িয়া শুনাইতাম। আমার চিন্তাজ্বরের আতিশয্য দেখিয়া গুরুজনেরা ভীত হইলেন, পাছে আমাকে অনতিবিলম্বে চিকিৎসার জন্য কোনও asylumবিশেষে পাঠাইতে হয়।

আমার শিক্ষক মহাশয় তাঁহাদিগকে বলিলেন, "ভয় নাই; গণেশের পাঠদ্দশায় বুঝিয়াছিলাম, তাহার মস্তকের মধ্যে গোময়ের ভাগই অধিক। সুতরাং তাহার আলোড়ন বিলোড়নে তড়িৎ বা উত্তাপের উৎপত্তি হইবার আশঙ্কা নাই।"

তিনি একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন, "বাবা গণেশ! তোমার দেবাংশে জন্ম। তোমার মধ্যে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় দৈবশক্তি প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিতেছে। তুমি আত্মবিস্মৃত বলিয়া তাহা বুঝিতে পারিতেছ না। গণপতি অষ্টাদশ পুরাণ ও বেদবেদাঙ্গ স্বহস্তে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। শুনিলাম, তুমিও তোমার বহুমূল্য গবেষণাসকল লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেছ। জগতের হিতার্থে তাহা প্রচার করিতে ভুলিও না।" আমি অনেক ঘুরিয়াছি ও অনেক দেখিয়াছি, এবং সেজন্য আমাকে অনেক রকম ভোল ফিরাইতে হইয়াছে। আমার ক্ষুদ্র জীবনে জুতা সেলাই হইতে চণ্ডীপাঠ পর্য্যন্ত সকলই ঘটিয়াছে। এই সকল কাজের সঙ্গে আমার গবেষণার থলীও পূর্ণ হইয়াছে। ভূতপূর্ব্ব গুরুর উপদেশ অনুযায়ী সম্প্রতি "জগতের হিতার্থে" আমি সেই থলী ঝাড়িয়া দিবার সঙ্কল্প করিয়াছি। এমতে আমার গবেষণাসমূহ এক্ষণে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিলাম। যদি এই অমূল্য গ্রন্থের পত্রগুলি কোন বণিকের দোকান হইতে মসলা বন্ধনের ব্যপদেশে বঙ্গের ঘরে ঘরে প্রবেশলাভ করে, তাহা হইলে আমার সকল শ্রম সার্থক হইল জ্ঞান করিব।

শ্রীগোবর গণেশ দেবশর্ম্মা

গোবর গণেশের গবেষণা

প্রথম পরিচ্ছেদ

ধর্ম্ম ও অনুষ্ঠান

ধর্ম্ম আমাদিগের মজ্জাগত বস্তু। ইহকালে আমরা ধর্ম্মের জন্য সকল জিনিস বিসর্জ্জন দিয়াছি; আর পরকালে এই ধর্ম্মই আমাদের একমাত্র সম্বল। ভারতবাসী জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ধর্ম্মোপার্জ্জন করিয়া থাকে। তাহার ধর্ম্মের বোঝা এই কারণেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভারি হইয়াছে। "ধর্ম্মো-যান্তমনুব্রজেৎ"—পরলোকে একমাত্র ধর্ম্মই আমাদের সঙ্গে গিয়া থাকে। ইহাকে ফেলিয়া যাইবার উপায় নাই।

কিন্তু এত ভারি লগেজ্ সঙ্গে লইয়া বৈতরণী পার হইয়া সুদীর্ঘ পরলোকের পথে পাড়ি দেওয়া কি সহজ কথা? এই জন্যই বোধ হয় বৈতরণী পারের সময় আমাদের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে। জগতের যে সকল জাতির ধর্ম্মের বোঝা হাল্‌কা, তাহারা সহজে হাসিতে হাসিতে বৈতরণী পার হইয়া যায়। জাপানীরা ধর্ম্মের ধার ধারে না, তাই তাহারা 'হারিকিরি' করিয়া ঝাড়া হাত-পায় ভুড়ীলাফ খাইয়া চলিয়া যায়। আর ম্যালেরিয়া, প্লেগ ও ওলা-উঠারূপী যমদূত আসিয়া যখন আমাদিগের গলায় দড়ী দিয়া টানে, তখন আমরা ধর্ম্মের বিরাট বোঝা মাথায় লইয়া বৈতরণীর জলের সঙ্গে চোখের জল মিশাইয়া চুবুনি খাইতে থাকি। ক্লাইভ তিন বার নিজের প্রাণ নিজে লইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার মাথায় সম্ভবতঃ ধর্ম্মের ভারি বোঝা ছিল না। আর আমাদের লক্ষ্মণ সেন তাঁহার সভাপণ্ডিত জয়দেব গোস্বামীর মুখে 'গীত গোবিন্দ' শুনিয়া শুনিয়া ধর্ম্মের বোঝা ভারি করিয়া বসিয়াছিলেন। তাই তিনি ইতিহাসের সন্ধিস্থলে পাঁজি পুঁথি দেখিয়া "যঃ পলায়তি স জীবতি" বাক্যের সার্থকতা প্রতিপাদন করিয়াছিলেন।

আমরা বচনে বলিয়া থাকি, মৃত্যুর জন্য আমরা সর্ব্বদাই প্রস্তুত; এবং উদাহরণস্বরূপে দেখাইয়া দেই যে, গঙ্গাগোবিন্দ মুখুজ্যের বৃদ্ধা পিতামহী মৃত্যুশয্যায় গঙ্গাজল ব্যতিরেকে আর কোন ঔষধ সেবন করেন নাই। কিন্তু আমাদের শতকরা নিরানব্বই জনের কঠিন রোগের সময় ডাক্তার-বৈদ্যের কেরামতিতেও কুলায় না; অধিকন্তু আমরা নবগ্রহের শান্তি স্বস্ত্যয়ন ও ঠাকুরের কাছে হত্যা দেওয়ার ব্যবস্থা করাইয়া থাকি। এ দেশে

ইতরসাধারণ লোক কলেরা ও বসন্ত রোগীর সেবা করিতে অসম্মত হয় না। ইহাতে প্রমাণ হয় না যে, তাহারা মরিতে ভীত নহে। সংক্রামক রোগের সেবায় যে কি বিপদ তাহা জানে না বলিয়াই তাহারা অসঙ্কোচে ঐ সকল রোগীর সেবা করিয়া থাকে।

নরহন্তা দস্যুর হাতে একটা পিস্তল দেখিলে আমরা সকলেই ভোঁ দৌড় মারি। বিপন্নকে রক্ষা করিবার জন্য আমরা মৃত্যুমুখে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারি কৈ? আমরা মনের জোরে কালভয় দূর করিতে পারি না; তাই কথায় কথায় কালভয়হারী হরিকে ডাকিয়া আনি। জন্মিলেই মরিতে হয়; তাই জন্মমৃত্যুর হাত এড়াইবার জন্য আমরা সর্ব্বদাই ব্যাকুল। আবশ্যক হইলে সহস্রবার মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিব এবং সহস্রবার মনুষ্যের মত প্রাণ বিসর্জ্জন করিব, এ আকাঙ্ক্ষা আমরা হৃদয়ে পোষণ করিতে শিখি নাই। আমরা শিখিয়াছি কেবল ধর্ম্ম করিতে—এরূপ ধর্ম্ম করা চাই, যাহাতে চিরদিনের মত আসা-যাওয়া ঘুচিয়া যায়।

আমরা সকল হারাইয়া একমাত্র ধর্ম্মকেই সার করিয়াছি। তাই সকল কাজেই আমরা ধর্ম্মের নাড়া দিয়া থাকি। প্রবলের অত্যাচারে নিপীড়িত হইয়া আমরা বলিয়া থাকি, "ধর্ম্ম আছেন, আমি সহিলাম, ধর্ম্মে সহিবে না"। আমাদের অক্ষমতার অনুপাতে ধর্ম্মের দোহাই বাড়িয়া গিয়াছে। আমাদিগকে যে ব্যক্তি পদাঘাতে সম্মানিত করিবে, আমরা তাহাকে করজোড়ে "ধর্ম্মাবতার" বলিয়া সম্বোধন করিব। দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপশালী প্রভুকে ভক্তি করাই প্রাচ্য জাতির ধর্ম্ম। তাহার শার্দ্দূল-

প্রকৃতি হইলে তাহার সমালোচনা করিবার কাহারও অধিকার নাই, করিলে অধর্ম্ম হইবে।

আমরা দিনগত পাপক্ষয় করিবার জন্য নিত্য কতই না ধর্ম্ম করিয়া থাকি। পেশ্‌কার রামধন মিত্র অতি নিষ্ঠাবান্ লোক। তিনি যে-দিন যত বার ঘুষ লন, পরদিন কাছারীতে গিয়া সর্ব্বাগ্রে তত শত দুর্গানাম লিখিয়া সেই পাপের রোক্ শোধ করিয়া দেন। আমাদের ধর্ম্মের সঙ্গে কর্ম্মের পদে পদে সম্বন্ধ আছে। কোন্ তীর্থের কোন্ কুণ্ডে স্নান করিলে কোন্ স্বর্গ লাভ হইবে এবং কত কাহণ কড়ি উৎসর্গ করিলে কোন্ পাপের খণ্ডন হইবে, আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে তাহার সুন্দর স্কেল বাঁধা আছে।

আমাদের ধর্ম্মের বহিরঙ্গ বিশেষ বিস্তৃত। আমাদের সকল কাজ ও বেশভূষার সঙ্গে ধর্ম্ম বিশেষভাবে জড়িত। হাই তুলিলে যে তুড়ি দিতে হয়, তাহারও শাস্ত্রসঙ্গত একাধিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে। যে ব্যক্তি মহাপাপী নরপিশাচ, সেও মস্তকে দীর্ঘ আর্ক-ফলা ধারণ করিয়া নিঃশঙ্কভাবে সমাজে বিচরণ করিতে পারিবে—তাহার মাথায় বজ্রাঘাত হইবার সম্ভাবনা নাই; কারণ চৈতন একপ্রকার Lightning Conductor। পক্ষান্তরে, সমাজের নিষ্ঠাবান্ ধর্ম্মপ্রবর দলপতি বাবুর উদর মধ্যে যদি কোন গতিকে কুক্কুট মাংস বা অন্য কোনরূপ গুরুপাক দ্রব্য প্রবেশ লাভ করে, তাহা হইলে তাঁহার শ্রীচৈতন্য-ফক্কিকা তখন বিশেষ-ভাবে হজ্‌মি-গুলির কার্য্য করিয়া থাকে। স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগের শিরোদেশ হইতে যথাসম্ভব রজতমূল্যে নানা প্যাটার্ণের টিকি সংগ্রহ করিয়া প্রত্যেকটির

গায়ে টিকিট মারিয়া গ্লাস-কেসের মধ্যে সাজাইয়া রাখিতেন। বোধ হয় অজীর্ণ রোগগ্রস্ত বাঙ্গালীজাতির হিতার্থে তিনি এই হজমি-গুলির একটি আড়ত খুলিবার মানস করিয়াছিলেন। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, চৈতনের এত গুণ থাকিতেও ভারত-প্রবাসী পাশ্চাত্য লোকেরা এতদিনেও মস্তকে শিখা ধারণ করিতে শিখিলেন না। আর, বড়ই দুঃখের বিষয় যে, প্রাচীন চীনজাতি রাষ্ট্রবিপ্লবের ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া তাহাদিগের চিরপ্রিয় বেণীবদ্ধ চৈতনকে চিরদিনের জন্য বিসর্জ্জন দিয়া বসিয়াছে।

ভারতবর্ষের সকল ধর্ম্মই অনুষ্ঠানগত। অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে ধর্ম্মসাধনা হয় না। বক্‌রিদের সময় এ দেশের মুসলমানেরা যে গোহত্যা করে, তাহা তাহাদিগের ধর্ম্মের অনুষ্ঠানবিশেষ। আর, হিন্দুদিগের গোরক্ষণী সভা হইতে যে গো-মাতার পূজা ও রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়, তাহাও একটি ধর্ম্মানুষ্ঠান। এই দুই ধর্ম্মানুষ্ঠানের পরস্পর সংঘর্ষে প্রতিবৎসর যে লাঠালাঠি হয় ও রক্তের নদী বহিয়া যায়, তাহা অবলোকন করিয়া স্বর্গে দেবতাগণ আনন্দে গাল কাত্ করিয়া হাসিতে থাকেন এবং ভারতবাসীর ধর্ম্মনিষ্ঠাকে শত ধন্যবাদ প্রদান করেন। আর, মর্ত্ত্যে রাজপুরুষেরা পূর্ব্বাপর এই সংঘর্ষের মধ্যে নির্লিপ্তভাবে অবস্থান করিয়া পক্ষাপক্ষের আইনমত ডিক্রি-ডিসমিস্ করিয়া শাসনদণ্ডের গুরুত্ব ও লঘুত্ব উপলব্ধি করেন। তাঁহারা হিন্দু-মুসলমানের ধর্ম্মানুষ্ঠানে বাধা দিতে পারেন না। প্রজার ধর্ম্মরক্ষা করাই রাজার ধর্ম্ম। শুনিয়াছিলাম, যখন দেশীয় লোকের ভলাণ্টিয়ার বা সখের সৈনিক হইবার ধূয়া উঠিয়াছিল, তখন নাকি নবদ্বীপ, ভট্টপল্লী ও অন্যান্য স্থানের কতিপয় চতুষ্পাঠীর ছাত্রবর্গ এই মর্ম্মে আবেদন

করিয়াছিল যে, যদি সরকার বাহাদুর তাহাদিগকে ভলাণ্টিয়ারের কার্য্যে নিযুক্ত করেন, তাহা হইলে তাহারা কটিদেশে নামাবলী বাঁধিয়া খড়ম পায়ে দিয়াও রণক্ষেত্রে কামানের গাড়ী ঠেলিতে সক্ষম হইবে; যেহেতু তাহাদিগের ব্রহ্মচর্য্যে চর্ম্মপাদুকা ও সূচি-ভেগ্য বস্ত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধ। কিন্তু সৈনিক বিভাগের কর্তৃপক্ষ-গণ দেখিলেন যে, যুদ্ধাভিযান সময়ে সকল স্থলে ইহাদের জন্য কোষা-কোষী, গঙ্গাজল ও পূজা-আহ্নিকের অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করা সম্ভব হইবে না, এবং সেজন্য ইহাদিগের ধর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যত্যয় হইবার সম্ভাবনা। এই আশঙ্কায় নাকি সরকার বাহাদুর তাহাদের আবেদন মঞ্জুর করিতে না পারিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

কি উপায়ে ভারতের প্রজাপুঞ্জের ধর্ম্মবিরোধ ঘুচিয়া যায়, অথচ তাহাদের সকলের ধর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে রক্ষা হয়, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য আমাকে একবার কিছুদিনের জন্য দেশের নানা-স্থান পর্য্যটন করিতে হইয়াছিল। আমি পাঞ্জাবে গিয়া দেখিয়া-ছিলাম, সেখানে শিখ ও মুসলমানের মধ্যে যতদূর ধর্ম্মবিরোধ, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ততদূর নহে। তাহার কারণ অনু-সন্ধান করিয়া বুঝিলাম যে, হিন্দু মুসলমানের ধর্ম্মের বিবাদ ঘুচাই-বার অভিপ্রায়ে গুরু নানক উভয়ের ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে সার সঙ্কলন করিয়া সামঞ্জস্যমূলক শিখধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বুঝিলাম, ধর্ম্মের সিমেণ্ট দিয়া রাম ও রহিম নামক দুই সহোদরকে জুড়িয়া এক করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। কিন্তু এখন সেখানে দাঁড়াইয়াছে রাম, রহিম ও গ্রন্থ-সাহেব; এবং এই তিন সহোদরের মধ্যে বহুদিন যাবৎ পৈতৃক বাস্তুভিটার জন্য পার্টিশনের মামলা

চলিতেছে। পঞ্চনদের কোন্ অংশ কাহার ভাগে পড়িবে তৎসম্বন্ধে এখনও কোন রায় বাহির হয় নাই।

বঙ্গদেশে রাজা রামমোহন রায় হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টিয়ানের মধ্যস্থ ধর্ম্মবিরোধের ত্রিভুজকে জ্যামিতির ছকে ফেলিয়া ধর্ম্ম-সমন্বয়ের গোলাকার বৃত্তে পরিণত করিতে গিয়া চতুর্ভুজ ধর্ম্ম-বিভ্রাট সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। রাজা বাহাদুরের নবজাত মানসপুত্র ব্রাহ্মসমাজকে হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টিয়ান সমাজের মধ্যে কোন সমাজই এক্ষণে আপনার ক্রোড়ে স্থান দিতে রাজী নহে। আশা হয়, এই শিশু বাঁচিয়া থাকিলে এক কালে সাবালক হইয়া বঙ্গের চার আনির সরিক হইয়া দাঁড়াইবে এবং অন্ন পৃথক্ করিয়া লইবে।

স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে এক বিখ্যাত হিন্দু বক্তা বলিয়াছিলেন, ভবিষ্যতে যথাকালে এ দেশের মুসলমানদিগের জন্য কণ্ঠী ধারণের ব্যবস্থা দিলেই সব গোল মিটিয়া যাইবে। কিন্তু স্বদেশী বক্তা আবদুল ইয়াকুব তাঁহার কোন হিন্দু বন্ধুকে বলিয়াছিলেন যে, তখন হিন্দুদিগকে একবার কল্‌মা পড়াইয়া লইলেই সব ধর্ম্মবিবাদ দূর হইয়া যাইবে, সুতরাং সেজন্য এখন নিরর্থক মাথা ঘামাইবার দরকার নাই। হিন্দু মুসলমান নেতাদিগের এই সকল মতামত শুনিয়া আমি বুঝিয়াছিলাম যে, কণ্ঠী ধারণ বনাম কল্‌মা পঠনের মাম্‌লা আপাততঃ মুলতবি আছে মাত্র, যথাসময়ে তাহা বিচারামলে আসিবে।

এ ত ভাল কথা নহে। ভারতের ধর্ম্মবিরোধ নির্দ্দোষে না ঘুচিয়া গেলে জাতি বা নেশন গঠন হইবে কি প্রকারে? আমার পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মসংস্কারকগণ এ পর্য্যন্ত যাহা পারিল না, আমাকেই

তাহা পারিতে হইবে। বঙ্গে হিন্দু মুসলমানের ধর্ম্মবিবাদ আমাকেই ঘুচাইতে হইবে। আমি ভিন্ন এ অসাধ্য সাধন আর কে করিবে? এ জন্য যদি গোবর গণেশ দেবশর্ম্মাকে একাদশ অবতার বলিতে হয় 'সো বি আচ্ছা।' ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইলেই অবতারের আবশ্যক হয়। ধর্ম্মের গ্লানি যে অতিমাত্রায় চলিতেছে, তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে? এমন অসংখ্য হিন্দু আছে, যাহারা ব্রাহ্ম ও ম্লেচ্ছ ধর্ম্মের গ্লানি না করিয়া জল গ্রহণ করে না। আবার অনেক গোঁড়া মুসলমান কাফেরদিগের ধর্ম্মের গ্লানি না করিলে নিজেদের ধর্ম্মসাধন হইল বলিয়া মনে করে না। আর এমন অনেক মিশনারি আছে, যাহারা ধর্ম্মপ্রচারের সময় কোন্ ধর্ম্মের যে গ্লানি না করে তাহা বলিতে পারি না। ধর্ম্মের যাবতীয় গ্লানি, সমস্তই ধর্ম্মবিরোধ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই ধর্ম্মের গ্লানি দূর করিতে হইলে ধর্ম্মবিরোধের মূলোৎপাটন করিতে হইবে। এই কার্য্য করিবার জন্যই আমি অবতীর্ণ হইয়াছি। সুতরাং অনেক গবেষণার পর আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, হিন্দুস্থানের ধর্ম্মসকল যখন আনুষ্ঠানিক বহিরঙ্গের উপর বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং মূলে সকলেই এক ও অভেদ, তখন একটা বিরাট ধর্ম্মসমন্বয় করিতে হইলে কতকগুলি প্রধান প্রধান ধর্ম্মানুষ্ঠানকে আবশ্যকমত পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া লইতে হইবে। অর্থাৎ হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টিয়ান ধর্ম্মের অনুষ্ঠানগুলি লইয়া হরেকরকম জোড়-কলম বাঁধিতে হইবে। উদাহরণস্বরূপ তাহার দু'চারটির উল্লেখ করিতেছি। শিশুদিগের অন্নপ্রাশনের সময় তাহাদের মুখে অন্ন দিয়া সঙ্গে সঙ্গে সুন্নৎ করিয়া দিতে হইবে। তাহা হইলে এই সকল শিশু হিন্দু ও মুসলমান উভয়

পরিবারেই পোষ্যপুত্ররূপে পরিগৃহীত হইতে পারিবে। আমাদের ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা দাড়ি গোঁফ ও মাথা কামাইয়া শুদ্ধ চৈতন রাখেন, আর মুসলমান মোল্লাগণ মাথা কামাইয়া দাড়ি গোঁফ রাখে। উভয়ের সামঞ্জস্য করিতে হইলে ব্রাহ্মণদিগের চিবুকদেশে চৈতন রাখিতে হইবে। কারণ, তাহা দাড়িকে দাড়ি এবং চৈতনকে চৈতন হইবে। আমাদের দেশীয় ব্যারিষ্টারগণ টিকিবর্জ্জিত হইয়া গোঁফ দাড়ি কামাইয়া মাকুন্দ সাজিয়া ভাল করিতেছেন না। ইহাতে মনে হয়, তাঁহারা না হিন্দু না মুসলমান। এরূপ ভাবে দু'য়ের বাহির হইয়া থাকিবার আবশ্যক কি? তাঁহারা যদি ফ্রেঞ্চ কাটের দাড়ি রাখিয়া চিবুকাগ্রভাগের লোমগুলিকে টিকির ভাবে লম্বা হইয়া গজাইতে দেন, তাহা হইলে তাঁহারা যদিচ্ছামত হিন্দু সমাজে বা মুসলমান সমাজে অবাধে চলিয়া যাইতে পারেন। হিন্দু সমাজে নামাবলীর লুঙ্গি প্রচলিত করিতে হইবে, এবং বদ্‌নাকে পূজার কমণ্ডলুরূপে ব্যবহার করিতে হইবে। বিস্কুটের হরির লুট ও শিক্-কাবাবের মালসা-ভোগ চলিত করিলে কৃষ্ণপন্থী, খৃষ্টপন্থী ও মুসাপন্থী কাহারই আপত্তি থাকিবে না।

এবম্বিধ পরিবর্ত্তিত আচার সমাজে প্রবর্ত্তিত করিতে হইলে একখানি বিস্তারিত নূতন তন্ত্র সৃষ্টি করা আবশ্যক। সুতরাং ভারতবাসীর হিতার্থে আমি তাহা প্রণয়ন করিতে বাধ্য হইয়াছি। এই তন্ত্র 'গোবর গণেশ তন্ত্র' নামে লোক-সমাজে প্রখ্যাত হইবে। এই তন্ত্রে আমি পঞ্চ-মকারের সহিত পঞ্চ-পকার যোগ করিয়াছি। পাঁউরুটি, পাঁঠা, পোলাও, পলাণ্ডু ও পয়জার—এই পাঁচটিকে লইয়া পঞ্চ-পকার। ভাষায় পলাণ্ডুকে পিঁয়াজ বলে। যে সাধকের ভাগ্যে শেষোক্ত দুই পকার

অর্থাৎ পিঁয়াজ ও পয়জারের সম্যক্ সাধন হইবে, তাহার অচিরে সিদ্ধিলাভ অনিবার্য্য। মৎপ্রণীত বলিয়া এই তন্ত্রের প্রতি কেহ যেন উপেক্ষা প্রদর্শন না করেন। রাধাকৃষ্ণের যোগে কলিতে গৌরাঙ্গদেব অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। আর হরপার্ব্বতীর অংশে কলির শেষভাগে আমি গণেশ দেবশর্ম্মা যখন অবতীর্ণ হইয়াছি, তখন এই নবযুগের উপযোগী নবতন্ত্র সৃষ্টি করিবার নিশ্চয়ই আমার পৈতৃক অধিকার আছে। 'অত্র সন্দেহো নাস্তি'।

আমি সোৎসাহে এই নবতন্ত্রের প্রচারকার্য্য আরম্ভ করিয়া দিলাম। খৃষ্টিয়ান মিশনারিগণ, রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামিজীগণ এবং ব্রাহ্মগণ আমাকে ঈর্ষার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। আমার অনেক হিন্দু ও মুসলমান শিষ্য জুটিয়া গেল। তাহারা একদিন পরস্পরের মধ্যে মৃতের সৎকার সম্বন্ধে বহু বাগ্‌বিতণ্ডা করিয়া মীমাংসার জন্য আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি বলিলাম—"হিন্দু ও মুসলমান সৎকার-পদ্ধতির সামঞ্জস্য করিতে হইলে মৃতদেহকে অর্দ্ধদগ্ধ করিয়া মৃত্তিকার মধ্যে কব্বর দিতে হইবে। কাল পূর্ণ হইলে আমি যখন দেহ রক্ষা করিব, তখন তোমরা তাহাকে কিঞ্চিৎ অগ্নি-সংস্কৃত করিয়া সমাধিস্থ করিবে।" আমার এই কথা শুনিয়া উভয় পক্ষ "ধন্য ধন্য" করিল। প্রচারের উদ্দেশ্যে আমাকে অনেক সভায় বক্তৃতা করিতে হইত। যেখানে যেরূপ শ্রোতা দেখিতাম, সেখানে সেইরূপ ঢংয়ের বক্তৃতা করিতাম। শ্রোতাদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণপণ্ডিতের অধিক সমাবেশ দেখিলে দ্বৈতাদ্বৈতবাদের জটিল সমস্যাকে ঘটত্ব পটত্ব দ্বারা আরও জটিল করিয়া তুলিয়া সকলের তাক্ লাগাইয়া দিতাম। শ্রোতার মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা অধিক দেখিলে হুসেন হাসে-

নের কথা পড়িয়া কোরাণ সরিফের দু'চারিটা লব্জ আওড়াইয়া তাহাদিগকে মোহিত করিতাম। সভাস্থলে তিলক ও কুঁড়োজালির ছড়াছড়ি দেখিলে গোপীভাবের অবতারণা করিয়া সকলকে মধুর রসে হাবুডুবু খাওয়াইতাম।

বাঁশ কাটিতে কাটিতে বাহু বলিয়া যায়। আমারও বক্তৃতা করিতে করিতে ক্রমে বক্তৃতার বাতিক বাড়িয়া গেল। একদিন কলেজের ছেলেরা আমাকে গোলদীঘীতে এক স্বদেশী সভায় বক্তৃতা করিবার জন্য লইয়া গেল। আমি সভাস্থলে লাল-পাগড়ির প্রাচুর্য্য দেখিয়া রাজনীতির কণ্টকাকীর্ণ পথ পরিহার পূর্ব্বক ধর্ম্মের ভিতর দিয়া স্বদেশী চালাইয়া দিলাম। বলিলাম—"গরুর হাড় দিয়া যে লবণ রিফাইন করা হয়, তাহা খাইলে কি হিন্দুর ধর্ম্ম থাকিবে? এই কথা শুনিয়া হিন্দু শ্রোতাগণ সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "না, না, আমরা ঐ লবণ খাইয়া গোখাদক হইতে পারিব না।" ইহাতে মুসলমান শ্রোতাগণ আরক্তনয়ন হইয়া উঠিল। আমি বেগতিক দেখিয়া মুসলমানদিগকে ঠাণ্ডা করিবার জন্য বলিলাম—"শুয়ারের রক্ত দিয়া যে চিনি রিফাইন্ করা হয়, তাহা সকলেরই অখাদ্য।" সভাস্থলে কতকগুলি নেটিভ খৃষ্টিয়ান, বিলাতফেরত্ বাঙ্গালী ও নমঃশূদ্র এবং নিম্নশ্রেণীর কয়েকজন কাওরা ও মেথর পর্য্যন্ত উপস্থিত ছিল। ইহাদের পক্ষ হইতে কেহ কেহ চীৎকার করিয়া আমার ঐ কথার প্রতিবাদ করিয়া উঠিল। আমি ধর্ম্মের ভিতর দিয়া স্বদেশী চালাইতে গিয়া বেয়াকুব বনিয়া গেলাম। বক্তৃতার অবশিষ্টাংশ আবল্ তাবল্ বকিয়া সারিয়া দিলাম। আমি আসন পরিগ্রহ করিবার সময় হিন্দুগণ "বন্দে মাতরং" এবং মুসলমানগণ "আল্লা হো আকবর" ধ্বনি করিল। তৎশ্রবণে আমি পুনরায়

গাত্রোত্থান করিয়া উভয় জয়-ধ্বনির একটা সামঞ্জস্য করিয়া হিন্দু ও মুসলমান শ্রোতাদিগকে বুঝাইয়া, সকলকে একযোগে "আল্লা হো মাতরং" বলাইলাম। একতাভিলাষী ছাত্রবৃন্দের আর আনন্দের সীমা রহিল না। মহা হৈ-চৈয়ের সহিত সভা ভঙ্গ হইল। তার পরদিন একখানি ইংরাজী সংবাদপত্রে এই কথা প্রকাশিত হইল,—

A NEW MENACE.

At yesterday's swadeshi meeting at College Square there appeared a new dangerous propagandist, who bears the queer name of 'Cowdung' Ganesh. He has cleverly hit upon a common 'war-cry' for Hindus and Mahomedans, *viz.* "*Alla-Ho-Mataram.*" He preaches swadeshi under the garb of religion, and in doing so yesterday he made inflammatory speeches setting Hindus against Mahomedans. For aught we know he poses as a Prophet and has already secured a large following. Evidently he wants to play the role of a Mahdi in India.

ইহা পাঠ করিয়া আমার প্লীহা চম্‌কাইয়া গেল। আমি সেই দিন হইতে স্বদেশী সভার নাম শুনিলে দূর হইতে নমস্কার করিতাম। আমি ধর্ম্ম-সংস্কারক; আমার ধর্ম্ম-সভা ব্যতীত অন্যত্র বক্তৃতা করিতে যাওয়াই অকর্ত্তব্য।

একদিন সহরতলীর এক হরি-সভায় আমার নিমন্ত্রণ হইল।

সভায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, কতকগুলি নব্য কেরাণীবাবু ও পেন্সন্‌ভোগী বৃদ্ধ ইহার পাণ্ডা। ধর্ম্ম-সভায় যোগদান করা এই শ্রেণীর পিণ্ডতে বাধে না। আমি মঞ্চোপরি দণ্ডায়মান হইয়া বক্তৃতার জন্য মুখব্যাদান করিবামাত্র শ্রোতৃবৃন্দ উচ্চরবে 'হরিবোল' দিয়া আমাকে অভিবাদন করিল। উৎসাহ পাইয়া বদ্ধ-নর্দ্দমার মত আমার মুখ খুলিয়া গেল এবং তাহা হইতে অনর্গল রঙবিরঙের বাক্যের ছটা বাহির হইতে লাগিল। আমি বলিলাম,—শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও ঘ্রাণ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, যাহার শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ নামক পঞ্চ তন্মাত্রা; এবং বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ, এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, যাহার ক্রিয়া হইতেছে বচন, গ্রহণ, গমন, পরিত্যাগ ও আনন্দ। এই দশেন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা হইতেছে মন, এবং তাহাকে লইয়া সর্ব্ব-সমেত একাদশ ইন্দ্রিয়। আমাদের দেহের মধ্যস্থ দেহী অর্থাৎ আত্মাই সকল ইন্দ্রিয়ের কর্ত্তা। এই আত্মা—অন্নময়, প্রাণ-ময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়—এই পঞ্চকোষের মধ্যে অবস্থিত। আমি দেখাইলাম যে, এই পঞ্চকোষ-মধ্যস্থ আত্মা কেমন করিয়া পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক—এই ত্রিবিধ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। ইহাই জীবের বন্ধন। জীব, শ্রবণ, মনন নিদিব্যাসনাদিযুক্ত কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের দ্বারা এই বন্ধন ছেদন করিয়া নির্ব্বি-কল্প সমাধি প্রাপ্ত হইয়া সাযুজ্য ও নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করে। বক্তৃতার মধ্যে আমি যখন তত্ত্বমসি, দ্বৈতাদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদের জটিল ব্যাখ্যা করিয়া, তাহার সহিত সাক্ষী চৈতন্য ও কূটস্থ চৈতন্যের হটচক্র বাধাইয়া ডাল খিচুড়ি পাকাইলাম, তখন সভা-

স্থলে একেবারে চারিদিক্ হইতে উচ্চ হরিধ্বনি পড়িয়া গেল। বুঝিলাম, বক্তৃতার যে অংশ যত দুর্ব্বোধ্য ও নিরর্থক, সেই অংশে ততই বাহবা পড়ে। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুশ্রোতা শব্দার্থগ্রাহী না হইলেও ভাবগ্রাহী বটে।

উপসংহারে আমি বিবর্ত্তবাদের অবতারণা করিয়া জ্যামিতি ও বীজগণিতের সাহায্যে বিশ্ব-প্রপঞ্চে পরব্রহ্মের সত্তা প্রতিপাদন করিয়া মধুরের সহিত সমাপন করিবার অভিপ্রায়ে বলিলাম,—"ব্রহ্মজ্ঞানের পরে লীলা। লীলাময়ের প্রতি সাধকের যে গোপীভাব, তাহা অতি উচ্চ অঙ্গের সাধনা। যুগে যুগে প্রেমময় নিত্য নূতন লীলা দেখাইয়া থাকেন। তাই, ভাবময় ভগবান রসরাজ আজ ভাবরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁর প্রাণোন্মাদকারী বাঁশী বেজেছে। সেই বাঁশীর রবে আমাদের মরা যমুনায় বান ডেকেছে, তাই যমুনা আজ উজান বহিতেছে। ঐ বাঁশীর ডাক শুনে আমরা কুলমান ভাসিয়ে দিয়ে দিশাহারা হয়ে ছুটেছি। এ যে পরকীয়া প্রেম, এ যে আমাদের ভাবের অভিসার। আমাদের এ অভিসার যেন জটিলা কুটিলা জানিতে না পারে। এ প্রেমের খেলায় জাতিভেদ নাই। হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম, খৃষ্টিয়ান,—সকলেই এ প্রেমের অধিকারী। হরিদাস মুসলমান হয়েও এই কৃষ্ণপ্রেম লাভ করেছিলেন। আজ আমরা হিন্দু মুসলমান এই প্রেমে উন্মত্ত হয়ে পরস্পরে কোলাকুলি করে একাত্মা হয়ে যাব।"

আমার বক্তৃতা সমাপ্তে করতালি ও হরিধ্বনি হইল। তৎপরে সভাভঙ্গের পূর্ব্বে স্থানীয় যুবকবৃন্দের সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। তাহারা অক্রূর-সংবাদের পালা হইতে এই গান গাহিল,—

(হরি) ভূভার হরিতে, এলে অবনীতে,
ভূভার হরণ করিলে কৈ ?—
সুখ বৃন্দাবনে, মধুর মিলনে
আছ সুখে, দুখ হরিলে কৈ ?—
কংশ অনুচরে করে অত্যাচার,
প্রজাগণ সদা করে হাহাকার,
শাসনে তাড়নে কণ্ঠাগত প্রাণ
তা'দের দুখ তুমি হরিলে কৈ ?-
জগতের রীতি আছে বিদ্যমান,
মাতৃ-দুখে কাঁদে সন্তানের প্রাণ,
তোমার জননী দেবকী বন্দিনী,
তাঁহার বন্ধন ঘুচালে কৈ ?

গান শেষ হইবার পূর্ব্বেই সভার কয়েকজন বৃদ্ধ অধ্যক্ষ রাধা-কৃষ্ণের নামোচ্চারণ করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। অবশিষ্ট অধ্যক্ষগণ সভাভঙ্গের পর আমাকে বিশেষ আপ্যায়িত করিয়া বিদায় দিলেন। কয়েকদিন পরে শুনিলাম হরি-সভায় আমার বক্তৃতা লইয়া চারিদিকে একটা বিষম আন্দোলন উঠিয়াছে। নিষ্ঠাবান্ হিন্দুগণ বলিতে লাগিলেন যে, হিন্দু সমাজকে নষ্ট করাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। তাঁহারা সুন্নৎ করা ও নামাবলীর লুঙ্গি পরার ঘোর বিরোধী হইয়া দাঁড়াইলেন। ক্রমে হিন্দু সমাজে আমার দলস্থ লোকের নিমন্ত্রণ ও হুকা-ছিলিম বন্ধ হইতে লাগিল। মুসলমান মৌলবীগণ বলিলেন যে, আমরা যদি তাঁহাদের সঙ্গে নমাজ না করি, ও এক পংক্তিতে বসিয়া গবাদির মাংস ভক্ষণ না করি, তাহা হইলে তাঁহারা আমাদের সহিত একজাতি হইতে রাজী

নহেন্। অগত্যা আমরা ব্রাহ্ম-সমাজের সেক্রেটারিকে পত্র লিখিলাম যে, তাঁহারা আমাদের সঙ্গে একসমাজভুক্ত হইতে সম্মত আছেন কি না? তিনি উত্তরে লিখিলেন, "বর্ত্তমানে একটি ব্রাহ্ম-সমাজ ভাঙ্গিয়া তিনটি সমাজ হইয়াছে। আপনাদিগকে ব্রাহ্ম করিয়া লইলে তিনটি সমাজের স্থলে চারিটি সমাজ দাঁড়াইবে।" আমি পরে কয়েকজন পাদ্রির সঙ্গে এ সম্বন্ধে আলাপ করিয়াছিলাম। আমরা পিতা, পুত্র ও পবিত্রাত্মায় বিশ্বাস না করিলে, এবং ক্রুশে বিদ্ধ যীশুকে ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া না মানিয়া লইলে, তাঁহারা আমাদিগের সঙ্গে ধর্ম্ম্য ও সামাজিক সন্ধি করিতে স্বীকৃত নহেন। এহেন শঙ্কটাপন্ন অবস্থায় একটি শিশু সমাজ অধিক দিন দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না। ক্রমে আমাদিগের সম্প্রদায় পাত্‌লা হইতে লাগিল। ভারতের ধর্ম্ম-বিরোধ ঘুচাইবার বিষয়ে আমি হতাশ হইয়া পড়িলাম।

এক সময়ে আমার এক "স্পিরিচুয়ালিষ্ট" বন্ধু ভূত নামাইয়া আমার ঐ সমস্যার মীমাংসা করিয়া দিতে সম্মত হইলেন। এক দিন সন্ধ্যার পর আমরা কয়েকজনে চক্র করিয়া বসিলাম। আমাদিগের মধ্যে একজন ভাল মিডিয়াম্ ছিল। তাহার স্কন্ধে দু'-চারজন দুষ্ট ভূতের পর বঙ্কিমচন্দ্রের প্রেতাত্মার আবির্ভাব হইল। তাঁহাকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে, কিরূপ ধর্ম্ম প্রচার করিলে এদেশের সমস্ত ধর্ম্ম-বিরোধ দূর হইবে। তিনি বলিলেন, "যে কোনও ধর্ম্ম প্রচার করিবে, তাহাতে ধর্ম্ম-বিরোধ বাড়িবে বই কমিবে না। একেশ্বরবাদমূলক যতগুলি ধর্ম্ম আছে, তাহারা চিরদিনই স্ব স্ব প্রধান হইয়া থাকিবে। তাহাদের একীকরণ অসম্ভব। কোনও কালেই জগতের সমস্ত মুসলমান খৃষ্টিয়ান হইবে

না, অথবা সমস্ত খৃষ্টিয়ান মুসলমান হইবে না। এই হেতু একেশ্বর-বাদের ধর্ম্মান্দোলন মাত্রেই সাম্প্রদায়িকতা প্রসব করে। যতই ধর্ম্ম লইয়া মাতামাতি করিবে, ততই নূতন নূতন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইতে থাকিবে।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে, তবে কি উপায়ে ভারতবাসীর ধর্ম্মবিবাদ ঘুচিবে? প্রেতাত্মা বলিলেন,—

“ভারতবাসী স্ব স্ব ধর্ম্মের আনুষ্ঠানিক বহিরঙ্গের প্রতি যে পরিমাণে ঔদাসীন্য দেখাইতে সক্ষম হইবে, তাহাদের ধর্ম্মবিরোধ সেই পরিমাণে তিরোহিত হইবে। সকল ধর্ম্মই মূলে এক; যত কিছু লাঠালাঠি তাহাদের বহিরঙ্গের অনুষ্ঠান লইয়া। প্রত্যেক ধর্ম্মের অনুষ্ঠানগুলি তাহার গায়ে খোঁচা বা কোণের মত লাগিয়া আছে। এই গুলি ঘষিয়া প্লেন করিয়া দিলে, ধর্ম্মে ধর্ম্মে ঠেকাঠেকি হইলেও ঠোকাঠুকি হইবে না।”

আমি বলিলাম—“আনুষ্ঠানিক অঙ্গ কমাইয়া দিলে ধর্ম্মের অস্তিত্ব কি করিয়া থাকিবে?”

প্রেতাত্মা বলিলেন—“ধর্ম্মের বাহিরের অঙ্গ যত বাড়াইবে, তাহার ভিতরের বস্তু ততই কমিয়া যাইবে। তুলসীদাস যথার্থই বলিয়াছিলেন, ‘মালা জপে শালা, কর জপে ভাই, মন মন জপে বলিহারি যাই।’ যেখানে বাহিরে অনুষ্ঠানের বাড়াবাড়ি, সেখানে ভিতরে ধর্ম্মের বিশেষ অভাব বুঝিতে হইবে।”

আমি বলিলাম—“ধর্ম্মের আনুষ্ঠানিক অংশ বর্জ্জন বা খর্ব্ব করিতে বলিলে নিম্নশ্রেণীর লোক কি লইয়া ধর্ম্মসাধনা করিবে? তাহাদের উন্মার্গগামী হইবার সম্ভাবনা।”

প্রেতাত্মা বলিলেন—“কেন? দয়া, দাক্ষিণ্য, সততা, সত্য-

বাদিতা, পরোপকারিতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের সঙ্গে ধর্ম্মানুষ্ঠানের বরং অধিকস্থলে বিপরীত সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়। ডাকাতেরা কালীপূজা করিয়া ডাকাতি করিবার জন্য সাহস বাড়াইয়া লয়। মদ্যপায়ী তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের দোহাই দিয়া নিঃসঙ্কোচে সুরাপান ও ব্যভিচার করে। যে দোকানদার সর্ব্বাঙ্গে হরিনামের ছাপ মারিয়া তুলসী-বনের বাঘ সাজিয়া দোকানদারি করে, খরিদদার অনেক সময় তাহারই নিকট অধিক প্রতারিত হয়। যে পুরোহিত দীর্ঘ শিখা সঞ্চালন করিয়া সবেগে ঘণ্টাধ্বনি করে ও উচ্চৈঃস্বরে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক হোমকুণ্ডে ঘন ঘন আহুতি দেয়, হোমের ঘৃত অপহরণ করিবার তাহারই অধিকার দৃষ্ট হয়। অল্পবুদ্ধি সাধারণ লোক ব্রাহ্মণপণ্ডিতের নিকট ভাষ লইয়া অনুষ্ঠানবিশেষের দ্বারা সাবেক পাপের কাটান করিয়া নূতন পাপ করিবার জন্য পাট্টা গ্রহণ করে। ধর্ম্মানুষ্ঠানের আতিশয্য নিবন্ধন এদেশবাসীর যথার্থ ধর্ম্মজীবনের ক্ষতি হইয়াছে ও হইতেছে। কবি হেমচন্দ্র বলিয়াছেন, 'যাগ যজ্ঞ আর জপ আরাধনা, এ সকলে এবে কিছুই হবে না।' তাঁহার এই বাক্যের মধ্যে সত্য নিহিত আছে।"

এই কথা বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের প্রেতাত্মা অন্তর্হিত হইলেন। তাঁহার মুখে এই সকল ধর্ম্মবিরুদ্ধ কথা শুনিয়া আমরা বুঝিলাম, বঙ্কিমবাবু স্থূল শরীরে যাহা ছিলেন, সূক্ষ্ম শরীরে তাহা নাই। তাঁহার প্রেতাত্মার কথায় আমাদের প্রত্যয় হইল না। সুতরাং আমরা অপর কোনও খ্যাতনামা ব্যক্তির প্রেতাত্মার আবাহন করিতে লাগিলাম।

অল্পক্ষণের মধ্যেই মিডিয়ামের স্কন্ধে বিবেকানন্দের প্রেতাত্মার ভর হইল। তাঁহাকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে, দেশে ধর্ম্মের

আনুষ্ঠানিক বহিরঙ্গ সাধনার লাঘব হইলে লোকসাধারণ ধর্ম্মহীন, চরিত্রহীন ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবে কি না, এবং ধর্ম্মান্দোলন ব্যতিরেকে জাতীয় উন্নতি সম্ভব কি না ?

তিনি বলিলেন—"আমি উদাহরণ দ্বারা এ কথার উত্তর দিব। আমি চীনদেশ পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছি। চীনদিগের ভাষায় 'ঈশ্বর'-বোধক কোন শব্দই নাই। সমস্ত চীন-সাম্রাজ্য পর্য্যটন করিয়া কেহ স্থির করিতে পারিবে না যে চীনদিগের ধর্ম্ম কি ? চীন মুল্লুকে চল্লিশ কোটি লোকের বাস। ধর্ম্মানুষ্ঠান বলিলে যাহা বুঝায়, এরূপ কোন কার্য্যই চীনজাতির মধ্যে প্রচলিত নাই। শুনা যায় চীনেরা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। বৌদ্ধধর্ম্ম নাস্তিক্য ও অহিংসাবাদ-মূলক। চীনেরা নাস্তিক বটে ; তাহারা ঈশ্বরোপাসনার ধার ধারে না। কিন্তু আহারের ব্যাপারে তাহারা শূয়ার গরু হইতে আরম্ভ করিয়া আরশুলা ইঁদুর পর্য্যন্ত বাদ দেয় না। অহিংসা ধর্ম্ম অন্যত্র থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা চীনে আদৌ নাই। চীনজাতির আনুষ্ঠানিক ধর্ম্ম না থাকিলেও, তাহারা যে চরিত্রহীন বা অকর্ম্মণ্য, এরূপ কথা কেহ বলিতে পারে না। দীর্ঘকাল অহিফেন সেবন করিতে বাধ্য হইয়াও চীনদিগের নৈতিক মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া যায় নাই। চীনা সওদাগরদিগের মুখের অঙ্গীকারই দলিলের মত গণ্য হইয়া থাকে ; তাহাদের কথার নড়চড় হয় না। চীনা কারিকরগণ কিরূপ কর্ম্মদক্ষ তাহা সকলেই জানে। ভারতবর্ষের চাষী ও শ্রমজীবিগণ অশেষ প্রকার ধর্ম্ম-কর্ম্ম করিয়া কাজ কর্ম্মে সাধ্যমত ফাঁকি দিয়া দেনা-পাওনার মোকদ্দমা লইয়া আদালত-ঘর করিয়া [illegible] অতিবাহিত করে। কাজ সম্বন্ধে তাহাদের কথার উপর নির্ভর করা চলে না। বাহ্য-ধর্ম্মানুষ্ঠানের সহিত ভিতরের ধর্ম্মবস্তুর

অল্পই সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়। ধর্ম্মানুষ্ঠান ও ধর্ম্মসংস্কার লইয়া যতই আন্দোলন করিবে, ততই ধর্ম্মবিরোধ বৃদ্ধি পাইয়া স্বাদেশিক একতাকে বিনষ্ট করিবে। জাপানীগণ ধর্ম্ম লইয়া উন্মত্ত হয় না বলিয়া তাহাদের মত অজেয় স্বদেশভক্ত জাতি জগতে দুর্লভ। মুসলমানদিগের মধ্যে আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মপ্রবণতা অত্যন্ত প্রবল। সে কারণে জগতের অন্যান্য সভ্যতার সঙ্গে ইস্‌লাম সভ্যতার সর্ব্বত্রই সংঘর্ষ ও তাহার পরাভব পরিলক্ষিত হয়। শিবাজী বর্ত্তমান যুগে গৈরিকের পতাকা উড়াইয়া গো-ব্রাহ্মণ রক্ষার উদ্দেশ্যে হিন্দু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তাঁহার সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। ক্রুজেড্ ও জেহাদ্ করিবার দিন আর এখন নাই। ধর্ম্মের ধ্বজা উড়াইয়া পদভরে মেদিনী কম্পিত করিবার যুগ চলিয়া গিয়াছে। এখন দেশভক্তির যুগ আসিয়াছে। এ যুগে ধর্ম্মনিরপেক্ষ Nationalism বা স্বাদেশিক জাতীয়তা সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিতেছে। আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মগুলি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে ইহার নিম্নে পড়িয়া থাকিবে।”

এই কথা বলিয়া বিবেকানন্দের প্রেতাত্মা চলিয়া গেলেন। আমি তাঁহার কথা শুনিয়া অবাক্ হইলাম। ইনি আজীবন গৈরিক পরিয়া ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া বেড়াইয়াছিলেন; এখন প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়া ধর্ম্মকে মাটির নীচে পুতিয়া ফেলিতে পরামর্শ দিতেছেন। ইঁহার মতে দেশের মাটি উপরে থাকিবে, এবং তাহার নীচে ধর্ম্ম থাকিবে। মাটির নিচে কিছুকাল থাকিলে ধর্ম্মও মাটি হইয়া যাইবে। হিন্দু ত নিজের ধর্ম্ম মাটি করিতে পারিবে না। ভারতের মুসলমানও তাহা পারিবে না; কারণ, তাহাকে সর্ব্বদা আমীর বাদসাহ ও মক্কার দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকিতে হইবে;

নিজের পায়ের নীচে যে মাটি পড়িয়া আছে, তাহার দিকে লক্ষ্য করিলে তাহার চলিবে না।

অতঃপর আমরা স্বদেশী ভূতের পরিবর্ত্তে বিদেশী ভূতের আবাহন করিলাম। অল্প সময়ের মধ্যে এক মাম্‌দো ভূত মিডিয়ামের উপরে নামিয়া আমাদিগকে "বঁ সোয়া, বঁ সোয়া" বলিয়া অভিবাদন করিল। আমাদের মধ্যে একজন নানাভাষাবিদ্‌ লোক ছিলেন। তিনি ভূতের কথা বুঝিতে পারিয়া আমাদিগকে বলিলেন যে, ইনি ফরাসীদেশীয় এক ব্যক্তির প্রেতাত্মা। পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় প্রেতাত্মা বলিল—"আমার নাম দাঁতন (Danton)। আমি ফরাসী বিপ্লবের সময়ের লোক। সেই সময়ে গিলোটিনে আমার অপঘাতে মৃত্যু হয়। তদবধি কেহ আমার নামে গয়াধামে পিণ্ড দান করে নাই বলিয়া, আমি এতাবৎ প্রেতযোনিতে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে করিতে গয়ার কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছি।"

কৌতূহল পরবশ হইয়া আমি এই মাম্‌দো ভূতকে ধর্ম্ম, সমাজ ও রাষ্ট্র বিষয়ক কতকগুলি প্রশ্ন করিতে ছাড়িলাম না। তদুত্তরে ভূত বলিলেন—"ফরাসী বিপ্লবের সময় আমরা ধর্ম্ম, সমাজ ও রাষ্ট্র, এই তিনটি বস্তুকেই ভাঙ্গিয়া চূরমার করিয়া, তাহাদের রাশীকৃত ভগ্নাবশেষের উপর সাম্য, স্বাধীনতা ও মৈত্রীর ধ্বজা গাড়িয়াছিলাম। আমরা বেশ বুঝিয়াছিলাম যে, ধর্ম্ম, সমাজ ও রাষ্ট্র—এই তিনটি জিনিস এক সূত্রে গাঁথা। ইহাদের দুইটিকে বজায় রাখিয়া তৃতীয়টিকে নষ্ট করা চলে না। ভাঙ্গিতে হয় ত তিনটিকেই একসঙ্গে ভাঙ্গিতে হইবে। রক্ষা করিতে হয় ত তিনটিকেই একসঙ্গে রক্ষা করিতে হইবে। আমাদের ভাঙ্গা দরকার

হইয়াছিল বলিয়া আমরা ইহাদের তিনটিকেই একযোগে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলাম।”

বৈদেশিক প্রেতাত্মার এই কথা আমার সঙ্গত বলিয়া বোধ হইল। তবে ফ্রান্সের সঙ্গে আমাদের দেশের অনেক প্রভেদ আছে। শান্তিময় ভারতের সমাজ ও রাষ্ট্রকে সর্ব্বথা রক্ষা করাই যখন আমাদের উদ্দেশ্য, তখন ধর্ম্মকেও অবশ্য সেইসঙ্গে সর্ব্বতো-ভাবে রক্ষা করিতে হইবে। কলিতে ধর্ম্ম পতনোন্মুখ। সুতরাং অনুষ্ঠান ও সংস্কারের চাড়া দিয়া ধর্ম্মের জীর্ণ ঘরখানিকে কোনও গতিকে খাড়া রাখিতেই হইবে। এই ঘর পড়িয়া গেলে গোবর গণেশ শর্ম্মা ও তাহার মত অসংখ্য ধর্ম্মপ্রাণ লোকের মাথা গুঁজিয়া থাকিবার স্থান থাকিবে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

—:)*(:—

আইন ও আদালত

আমার এক উকীল-বন্ধু আমাকে বলিয়াছিলেন, ধর্ম্মের ভিতর দিয়া দেশের কাজ করা সহজ না হইলেও, আইনের ভিতর দিয়া তাহা সহজে করা সম্ভব হইবে। কেন না, সমগ্র ভারতবর্ষে এক ধর্ম্ম চলিত নয়, কিন্তু সমস্ত দেশই এক আইনের অধীন। এক দণ্ডবিধি আইন ও কার্য্যবিধি আইন আসমুদ্র-হিমাচলকে শাসন করিতেছে। কথাটি নিতান্ত অসঙ্গত নয়। বাস্তবিক, এই আইনের বেড়া জালে দেশের চুনা পুঁটি হইতে রুই কাতলা পর্য্যন্ত সকলেই আবদ্ধ হইয়া বৈধ উপায়ে নিজ নিজ স্বার্থ ও অধিকার অন্বেষণ করিতেছে। কেহ কাহাকেও প্রবঞ্চনা করিতে পারে না, কেহ কাহারও উপরে অত্যাচার করিতে পারে না। ইহাতে যেমন একদিকে সমাজ রক্ষা হইতেছে, অপরদিকে নিরুপদ্রবে দেশেরও কাজ চলিতেছে। আইন আদালত না থাকিলে সমাজ ধ্বংস হইয়া যাইত, এবং কংগ্রেস কন্‌ফারেন্সের নামও কেহ শুনিত না। দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যে আইনের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিবার জন্য যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া ওকালতি ও ব্যারিষ্টারি পাশ করিতেছেন, ইহাই তাহার মূল কারণ। তাঁহারা বুঝিয়াছেন, ব্যবহারজীবী হইতে

না পারিলে দেশের কাজে অধিকার জন্মাইবে না। কংগ্রেস কন্‌ফারেন্স প্রভৃতি যতকিছু দেশচর্য্যের কার্য্য আছে, তাহা সমস্তই ব্যবহারাজীবদিগের একচেটিয়া। ইঁহারা আইনসঙ্গত বৈধ উপায়ে কেমন সুন্দরভাবে দেশের কাজ করিতে পারা যায়, তাহার পথ দেখাইয়াছেন। আমরা সকলেই এখন সেই রাজনৈতিক পথের পথিক।

আইনের মেচ্‌কো ফের বড় বিষম ফের। যাঁহারা আমাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা, ব্যবহারাজীব পেট্রিয়ট্‌গণ তাঁহাদিগকে মধ্যে মধ্যে এই আইনের ফেরে ফেলিয়া দেশের জন্য দফায় দফায় স্বত্বাধিকার আদায় করিয়া থাকেন।

তাই আমি আইনব্যবসায়ী দেশহিতৈষিগণের চিরদিনই পক্ষপাতী। তথাপি তাঁহাদের দলের নেতাগণ দেশের কর্ম্মক্ষেত্রে কিরূপ সিংহবিক্রমে কার্য্য করিয়া থাকেন, তাহা চাক্ষুস করিবার জন্য আমি একবার তাঁহাদের ন্যাশনাল্ কংগ্রেস্ দেখিতে গিয়াছিলাম। সেইবার সৌরাষ্ট্রে এই কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়াছিল। দেখিলাম, কংগ্রেসের রঙ্গমঞ্চ যেন একটি বিরাট স্বয়ম্বর-সভা। তাহার চারিদিকে লাল পতাকা, নীল পতাকা, শ্বেত পতাকা, পীত পতাকা, এবং তাহাদের মধ্যে মধ্যে ইউনিয়ান্ জ্যাক্ পতাকা পত্‌পত্ শব্দে প্রোড্ডীয়মান হইতেছে। ভারতের নানাদিগ্দেশাগত নানাবিধ মুকুটধারী নানাবর্ণের প্রতিনিধিগণ ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, যম, হুতাশনের ন্যায় সভা উজ্জ্বল করিয়া বসিয়া আছেন। সেই মহতী সভার পতিত্বে বৃত হইবার জন্য বঙ্গের এক দিগ্‌গজ ব্যবহারাজীব বঙ্গজ কায়স্থ গাত্রোত্থান করিলেন। অমনি গঙ্গাধর তিলক নামক এক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ তাঁহার আশাপথ রোধ করিয়া

তিল ভাণ্ডেশ্বরের ন্যায় অচল অটল ভাবে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন কাহার গলায় বরমাল্য প্রদত্ত হইবে, এই সমস্যা লইয়া সভাস্থল ভীষণ রণস্থলে পরিণত হইল। আমার তাহা দেখিয়া দ্বাপর-যুগের দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের কথা মনে পড়িল। দেশের যত বড় বড় ব্যবহারাজীব ও তাঁহাদের সাঙ্গোপাঙ্গগণ বঙ্গজ কায়স্থের পক্ষে অস্ত্রধারণ করিলেন, এবং তাঁহারা সকলে মিলিয়া কংগ্রেস্ কুমারীকে হরণ করিয়া লইয়া গেলেন। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে সুভদ্রাহরণ হইয়া গেল। দরিদ্র ব্রাহ্মণ তিলকের দলস্থ লোকেরা ছত্রভঙ্গ হইয়া রণে ভঙ্গ দিলেন। এই সংগ্রামে বৈধদল জয়লাভ করিলেন। তাঁহারাই যে দেশের কাজ করিবার একমাত্র অধিকারী, আমি সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইলাম।

তদবধি আমি ব্যবহারাজীবদিগের বৈধদলে স্পষ্টাক্ষরে নাম লিখাইলাম। আমার সামলা মাথায় দিয়া উকিল সাজিবার অধিকার ছিল না সত্য। আমি না হয় ঐ দলের তামাক সাজিব, তাহাতে ত আমার অধিকার আছে। অতএব আমি তাঁহাদের সঙ্গে সকল কাজে মেশামিশি আরম্ভ করিলাম। আমি তাঁহাদের ন্যাশনাল্ ফণ্ড্ প্রভৃতির চাঁদা আদায় করিবার ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। তাঁহাদের সভাসমিতির বিজ্ঞাপন বিতরণ করিয়া দেশের কাজ করিতাম এবং তাঁহাদের অন্যান্য যতকিছু হুকুম সমস্তই তামিল করিতাম।

এইভাবে কিছুদিন তাঁহাদের কাজকর্ম্ম করিয়া দেখিলাম, দেশের সকল শ্রেণীর উপর তাঁহারা এক আশ্চর্য্য মোহজাল বিস্তার করিয়াছেন। ধর্ম্মাধিকরণে পৌরোহিত্য করিয়া আইন-দেবীর বরে তাঁহারা এই সম্মোহনশক্তি লাভ করিয়াছেন।

দেশের লোক-সাধারণকে তাঁহারা যে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, একটি সামান্য ঘটনা হইতে আমি তাহার প্রমাণ পাইয়াছিলাম। একদিন দুই ব্যক্তিতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব লইয়া তর্ক হইতেছিল। প্রথম ব্যক্তি বলিতেছিল, "ঈশ্বর নাই"; দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিতেছিল, "ঈশ্বর আছেন"। কিছুক্ষণ ঘোর বাক্‌বিতণ্ডার পরে প্রথম ব্যক্তি বলিল, "তুমি বৃথা তর্ক করিতেছ; হাইকোর্টের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উকিল বলিয়াছেন যে ঈশ্বর নাই; সুতরাং ঈশ্বর কিছুতেই থাকিতে পারেন না।" এই কথায় দ্বিতীয় ব্যক্তি নিরুত্তর হইল। বাইবেলে আছে, "আদিতে বাক্য ছিল, বাক্য ঈশ্বরের সঙ্গে ছিল, এবং সেই বাক্যই ঈশ্বর"। আইন-ব্যবসায়ে এই বাক্যের সাধনা করিতে করিতে ক্রমে বাক্‌সিদ্ধি লাভ হয়। সুতরাং বাক্‌সিদ্ধ বড় উকিলের মুখের কথায় যে ঈশ্বর ভস্মীভূত হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

আমি আইনব্যবসায়ীদিগের প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র ধর্ম্মাধিকরণে যাতায়াত আরম্ভ করিলাম। ইহা এই যুগের মহাতীর্থ—দ্বিতীয় প্রয়াগ। এখানে হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টিয়ান—এই ত্রিধারার নিত্য অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ হইয়া থাকে। এই তীর্থের পাণ্ডারূপী উকিল মোক্তারগণ এক আইনের ক্ষুরে সকল জাতির ও সকল শ্রেণীর মাথা মুড়াইয়া জাতীয় একতা স্থাপনের সহায়তা করিতেছেন। মাম্‌লা-কণ্ডূয়ন-পীড়িত মক্কেল জুটিবামাত্র মোক্তার মহাশয়—"আসামী মজকুর আমাকে কিল চড় লাথি ঘুসাদ্বারা বহুতর মারপিট করিয়াছে ও বদ্‌জবানে গালিগালাজ করিয়াছে, বিবরণ এজাহারে প্রকাশ করিব"—এই মামুলী আর্জি লিখিয়া হুজুরে পেশ করিয়া মোকদ্দমার গোড়াপত্তন করিতেছেন, কিন্তু পক্ষগণের অর্থা-

ভাবে ইহাদের মধ্যে অনেক মোকদ্দমা জরায়ুস্থ রুগ্ন ভ্রূণের মত গর্ভেই নষ্ট হইয়া যাইতেছে, এবং নিষ্পত্তিকালে—"গ্রামের পঞ্চজনা ভদ্রলোক আমাদের এই মোকদ্দমা আপোষে নিষ্পত্তি করিয়া দিলেন"—এই মর্ম্মে সওয়া আট গণ্ডা পয়সা ব্যয় করিয়া রাজীনামা দাখিল করা হইতেছে। রাজমার্গে মলমূত্র ত্যাগের জন্য দ্বিপদ মনুষ্যের দণ্ড হইতেছে। কিন্তু শকটবাহী অশ্ব-গবাদি চতুষ্পদ জীবসকল রাজপথে পর্ব্বতপ্রমাণ পুরীষ ও কলসীপ্রমাণ মূত্রত্যাগ করিয়াও দণ্ডনীয় হয় না, ইহা দেখিয়া আমি আইনের বৈষম্য উপলব্ধি করিলাম। এ সকল ফৌজদারী আদালতের ব্যাপার।

দেওয়ানী আদালতে দেখিলাম, বাকী খাজনার নালিশে উকিল মহাশয়গণ—"বাদিগণের সহিত এই প্রতিবাদিগণের কস্মিন্‌কালে রাজা-প্রজা সম্বন্ধ ছিল না, বা এক্ষণে নাই"—এই বাঁধাগতের বর্ণনাপত্র দাখিল করিয়া, মক্কেলদিগকে প্রমাণের জন্য তদ্বির করিতে পরামর্শ দিতেছেন। দেওয়ানী আদালতের কার্য্যে রকমারি অনেক। পার্টিশন্, উইল-প্রোবেট্, স্বত্ব-সাব্যস্ত, ডিক্রী-জারি, নিলামরদ, ড্যামেজ্, কণ্ট্রাক্ট্, রিসিভার-নিয়োগ প্রভৃতি রকমারির অবধি নাই।

ধর্ম্মাধিকরণে প্রতিপদার্পণে দক্ষিণা লাগে। আদালতের মাটি অর্থের জন্য সর্ব্বদাই হাঁ করিয়া আছে। হাইকোর্ট উচ্চ অঙ্গের ধর্ম্মাধিকরণ। সেখানকার ব্যবহারাজীবগণ সামলার পরিবর্ত্তে নীল ও কৃষ্ণবর্ণের গাউন পরিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের বিদ্যাও নাকি উচ্চ অঙ্গের। এই হেতু তাঁহারা পালিতকে 'পলিট্', সিংহকে 'সিনা', মিত্রকে 'মিটার' এবং সুরকে 'সুওর' বলেন, এবং আইনের সূক্ষ্মতর্কের মীমাংসার জন্য মাননীয় হাকিমদিগের সম্মুখে

আইন-পুস্তকের পিরামিড রচনা করেন। হাইকোর্টের উপরে সাগরপারে প্রিভি কাউন্সিল্। না জানি, সেখানকার ব্যবহারা-জীবগণ কোন্ দিব্যলোকের জীব।

আমি কৌতূহল পরবশ হইয়া একবার হাইকোর্ট দেখিতে গিয়াছিলাম। দেখিলাম আদালতের উচ্চতার সঙ্গে তাহার প্রাসাদের উচ্চতার সামঞ্জস্য আছে। এখানে বিচারের অনেক-গুলি এজলাস। প্রত্যেক এজলাসে প্রায়ই দুইজন করিয়া হাকিম বসিয়া থাকেন। একটি এজলাসে দেখিলাম, পাঁচজন হাকিম বসিয়া বিচার করিতেছেন। শুনিলাম, ইহাকে ফুলবেঞ্চ বলে। আমি বুঝিলাম, ইহা হাকিমদিগের পঞ্চায়েত। উকিল, এটর্ণী ব্যারিষ্টার, আরদালী, উকিলের মুহুরী, ব্যারিষ্টারের বাবু ও লাল কালা পুলিসে আদালত জম্‌জম্ করিতেছে। এখানে বৈধ-বিদ্যা বিস্তারের জন্য লাইব্রেরী অর্থাৎ পাঠাগার আছে। অন্যান্য স্থানের পাঠাগারের মধ্যে পাঠেরই ব্যবস্থা আছে, খোসগল্প করা নিষেধ। কিন্তু এখানকার পাঠাগারে চা, চুরুট, টিফিন্ ও খোসগল্পের ভাগই অধিক। হাইকোর্টে মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া গেলে নজীরের সৃষ্টি হয়। যত দিন যাইতেছে, নজীরের পুঁথী ততই বাড়িয়া যাইতেছে। এ পুঁথীর কোথায় যে অন্ত হইবে, তাহা অন্তর্যামীই জানেন। নজীরের মূল্য এই যে, খেলোয়াড় ব্যবহারা-জীবগণ এই নজীরের কিস্তিতে নিম্ন আদালতের অনেক হাকিমকে মাত করিয়া ছাড়েন।

হাইকোর্টে মাম্‌লা করা বিশেষ ব্যয়সাধ্য। এখানে উকিল ব্যারিষ্টারের প্রাপ্যগণ্ডা মোহরের হিসাবে গণিয়া দেওয়া হয়। সতের টাকায় এক মোহর। অমুকের ফী এত টাকা না বলিয়া

এত মোহর বলিতে হইবে, নচেৎ চণ্ডী অশুদ্ধ হইয়া যাইবে। ইহা হইতে জানা যায় যে, দরিদ্রদেশ ভারতবর্ষের কোথাও গোল্ড্ ষ্ট্যাণ্ডার্ড না চলিলেও, হাইকোর্টের ব্যবহারাজীবদিগের মহলে তাহা পূর্ণমাত্রায় চলিতেছে। এখানে মোহরের ছড়াছড়ি, ইহা একালের স্বর্ণলঙ্কা।

হাইকোর্ট দর্শন করিয়া বাহিরে আসিবার সময় গেটের নিকট একটি রুক্ষকেশ মলিনবেশ বৃদ্ধের উপরে আমার দৃষ্টি পতিত হইল। লোকটি ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া বিড়বিড় করিয়া কি বকিতেছে। তাহার কাছে অনেকগুলি লোক জমিয়া গিয়াছে, এবং কেহ কেহ বিদ্রূপের স্বরে তাহার দরখাস্তের কি হইল জিজ্ঞাসা করিতেছে।

আমি লোকটির সঙ্গে আলাপ করিলাম। সেও আমাকে সম্ভবতঃ তাহার সমশ্রেণী জীব বলিয়া বুঝিতে পারিল, এবং সে কারণে আমার সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া কথা বলিতে লাগিল। জানিলাম, তিনি এক ধনবান্ জমীদার ছিলেন, এবং জেদের বশবর্ত্তী হইয়া সামান্য খুটিনাটি লইয়া আদালতের ন্যায়-বিচারের প্রত্যাশায় অনেকবার হাইকোর্ট এবং কয়েকবার প্রিভি কাউন্সিল্ পর্য্যন্ত মামলা চালাইয়াছিলেন। তাঁহার মোকদ্দমায় প্রায়ই বড় বড় উকিল ও ব্যারিষ্টারগণ নিযুক্ত হইতেন। সুতরাং তাঁহার প্রায়ই জয়লাভ হইত। এইরূপে বহুতর মোকদ্দমায় জয়লাভ করিতে করিতে, তাঁহার আয়ের তালিকা হইতে ব্যয়ের তালিকা ক্রমশঃই ভারি হইয়া, তাঁহার সমগ্র সম্পত্তি শনৈঃ শনৈঃ মোহরে পরিবর্ত্তিত হইয়া ব্যবহারাজীবদিগের উদরে প্রবেশ করিল।

এই সময়ে একটি বিশেষ জেদের মোকদ্দমায় তাঁহার নিম্ন আদালতে হার হইল। তিনি বাধ্য হইয়া তাঁহার নষ্টাবশিষ্ট

সম্পত্তির শেষ কপর্দ্দক পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিয়া বিস্তর টাকা রুশুম দিয়া হাইকোর্টে আপিল দায়ের করিলেন। আপিল একটু কমজোর ছিল। একজন বড় উকিল বা ব্যারিষ্টার নিযুক্ত না করিলে আপিল নামঞ্জুর হইতে পারে। কিন্তু বড় উকিলের বড় পেট। তাহা পূরাইতে অনেকগুলি টাকার আবশ্যক। বৃদ্ধ জানিতেন তাঁহার ঘরে টাকা নাই। তথাপি মন প্রত্যয়ের জন্য সমস্ত সিন্দুক, বাক্স, পেটারা একে একে খুলিয়া দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, তাহাদের সকলগুলিই মোকদ্দমার কাগজপত্রে বোঝাই হইয়া আছে—অর্থে নহে। আজীবন মাম্‌লার ফল-স্বরূপ বহু অর্থের বিনিময়ে এই স্তূপাকার রায়, ফয়সালা-রুবকারি, বয়নামা ও সই-মোহরের নকলাদি সংগৃহীত হইয়াছিল। সুতরাং ইহা অনেক টাকার মাল। আইনজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই ইহার কদর বুঝেন। চোরডাকাত ইহার কিম্মত জানে না; তাই তাহারা গৃহস্থের সিন্দুক বাক্স ভাঙ্গিয়া দলিলাদি ফেলিয়া টাকাকড়ি লইয়াই পলায়ন করে।

বৃদ্ধ এই সকল কাগজপত্র হইতে বাছিয়া কতকগুলি পোকা-কাটা সাদা দলিলের ষ্ট্যাম্প পাইলেন, এবং তাহা লইয়া একজন ষ্ট্যাম্প-ভেণ্ডারের নিকট গেলেন। আশা এই, এগুলি বিক্রয় বা ফেরত করিয়া যদি কিছু অর্থের উদ্ধার হয়। ভেণ্ডার বলিল,—"এ সকল ষ্ট্যাম্প তমাদি হইয়া গিয়াছে, সুতরাং কালেক্টরী হইতে ইহার রিফণ্ড্ পাওয়া যাইবে না। তবে যদি আপনি এগুলি কিছুদিন ধরিয়া রাখিতে পারেন, তাহা হইলে বিশেষ বিশেষ খরিদদার নিজের আবশ্যকমত ইহার এক একখানি বিশগুণ মূল্য দিয়া খরিদ করিবে। যাহারা দলিল

জাল করে, তাহাদের নিকট এগুলি অমূল্য।” বৃদ্ধ চিরদিন আদালতের ন্যায়-বিচার ভিন্ন আর কিছু জানিতেন না। সুতরাং জাল জুয়াচুরির কথা শুনিয়া কাণে আঙুল দিয়া চলিয়া আসিলেন। শেষে পরিবারবর্গের নোলক-মাকড়ী পর্য্যন্ত বেচিয়া অনেক ফী দিয়া এক বড় ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করিলেন। কারণ, এই আপিলই তাঁহার ‘লাষ্ট্ চান্স্’। দুর্ভাগ্যবশতঃ, যে দিন আপিল মঞ্জুরের শুনানি হইল, সে সময় তাঁহার বড় ব্যারিষ্টার কার্য্যগতিকে উপস্থিত হইতে পারিলেন না। তাঁহার জুনিয়ার অনেক লড়ালড়ি করিলেন, কিন্তু আপিল কিছুতেই এ্যাড্মিট্ হইল না।

ব্যারিষ্টার ফী ফেরত দিলেন না—তিনি তাহা ফিরাইয়া দিতে বাধ্য নহেন। তখন বৃদ্ধ তাঁহার উকীলকে বলিলেন, মাননীয় বিচারপতিগণ যখন আপিল আদৌ মঞ্জুর করিলেন না, তখন তিনি রুশুমের টাকা কেন ফেরত পাইবেন না? অন্ততঃ তাহার শতকরা সামান্য কিছু কাটিয়া লইয়া বাকী টাকা তাঁহাকে ফিরাইয়া দেওয়া উচিত। তাঁহার উকিলগণ বলিলেন যে, রুশুমের টাকা ফেরত দেওয়া হাইকোর্টের প্রথা নহে। তিনি বলিলেন, টাকা ফেরতের প্রার্থনা করিয়া অন্ততঃ একখানা দরখাস্ত করিয়া দেখা যাউক, যেহেতু এই টাকা ফিরাইয়া না পাইলে তাঁহাকে পথের ভিখারী হইতে হইবে। তাঁহার পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও কোন উকিল এরূপ দরখাস্ত করিতে সম্মত হইলেন না। তাঁহারা বলিলেন যে, দেওয়ানী কার্য্য-বিধি আইনের কোথাও এরূপ দরখাস্ত করা যাইতে পারে বলিয়া লেখা নাই।

তখন তিনি হিন্দু-ল-অভিজ্ঞ এক বড় উকিলের নিকট

তাঁহার কি করা উচিত তৎসম্বন্ধে ওপিনিয়ন্ লইলেন। উকিল মহাশয় একখানি প্রাচীন শাস্ত্র-গ্রন্থ হইতে "মার্গহস্তং বনং ব্রজেৎ" এই text বাহির করিয়া তাঁহাকে দেখাইয়া বানপ্রস্থের ব্যবস্থা দিলেন। কিন্তু এ ব্যবস্থা তাঁহার মনঃপূত হইল না।

তখন অগত্যা বৃদ্ধ স্বয়ং ঐ মর্ম্মে একখানি দরখাস্ত লিখিয়া লইয়া গিয়া এজলাসের মধ্যে বেঞ্চক্লার্কের হাতে দিলেন। বেঞ্চক্লার্ক মহাশয় দরখাস্তখানি পড়িয়া তাঁহাকে বলিলেন, "আপনার উকিল কোথায়?" তিনি বলিলেন, "উকিল মহাশয় এই দরখাস্ত হাতে করিয়া দাখিল করিতে রাজী নহেন।" বেঞ্চক্লার্ক একটু হাসিয়া দরখাস্তখানি ফিরাইয়া দিলেন। বৃদ্ধ নাছোড়বান্দা হইয়া দরখাস্ত দাখিল করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। তখন এজলা-সের মধ্যে গোলযোগের আশঙ্কা দেখিয়া বেঞ্চক্লার্ক আরদালিদিগকে ইঙ্গিত করিলেন। তাহারা বৃদ্ধকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিল। বৃদ্ধ বারাণ্ডায় আসিয়া "আমি দরখাস্ত দিব, আমি দরখাস্ত দিব" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। তাঁহার চারিদিকে লোক জমিয়া গেল। তখন গণ্ডগোল দেখিয়া সার্জেণ্ট্ আসিয়া তাঁহাকে অর্দ্ধচন্দ্রের সম্বর্দ্ধনা সহকারে নীচে নামাইয়া দিল। সেই দিন হইতে বৃদ্ধের হাইকোর্টে প্রবেশ বন্ধ হইল।

তদবধি তিনি প্রত্যহ সেই দরখাস্তখানি পকেটে করিয়া হাইকোর্টে আসিতেন, এবং গেটের কাছে পথে দাঁড়াইয়া ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া অস্ফুটস্বরে বিড়বিড় করিয়া কি বকি-তেন। অনেকে বলিত, তাঁহার মাথার কিঞ্চিৎ গোলযোগ হইয়াছিল। আমি কিন্তু তাঁহার সহিত কথা কহিয়া তাহা বুঝিলাম না। তিনি উপরের আদালতে নিত্য তাঁহার

বাচনিক দরখাস্ত পেশ করিতেন মাত্র। পূর্ব্বঅভ্যাসমত তিনি প্রত্যহ আদালতে আসিতেন। তিনি বলিলেন যে, ইহাতে তাঁহার শারীরিক স্বাস্থ্য ও চিত্তের প্রসন্নতা বৃদ্ধি পায়। আদালতের বিশুদ্ধ বায়ু মনের ও দেহের বিশেষ পুষ্টিকর। ইহাতে অগ্নিমান্দ্য দূর হইয়া যায়। অনেক মাম্‌লাবাজ লোকের নিত্য কাছারী না আসিলে ভাত হজম হয় না। এই কারণে দেশের লোকের আদালতে গতিবিধির সঙ্গে সঙ্গে জঠরানলও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।

ভারতবাসীর যে আদালতে যাতায়াত ক্রমশঃই বাড়িয়া যাইতেছে, তাহা সকলেই জানে। ঔদরিক কারণ ব্যতীত ইহার আরও একটি বিশিষ্ট কারণ আছে। রেস-কোর্সে ঘোড়ার খেলায় এত লোকসমাগম হয় কেন? তূলার খেলায়, আফিমের খেলায় এত অধিক লোক হইত কেন? জুয়াখেলার যে একটা উন্মাদনা—একটা বিশেষ আকর্ষণ আছে, একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। তাই জুয়াড়ীগণ পুনঃপুনঃ জরিমানা দিয়াও ঐ খেলা হইতে নিবৃত্ত হইতে পারে না। এ দেশের মাম্‌লা-মোকদ্দমার মধ্যে যে ঐরূপ একটা উন্মাদনা—ঐরূপ একটা আকর্ষণ আছে, তাহা কোন কোন উচ্চশ্রেণীর ইংরাজ লেখকও স্বীকার করেন।* আশার কুহকে জুয়াড়ীর সর্ব্বনাশ হয়। ধর্ম্মাধিকরণও

*"It is well known and thoroughly understood among our Continental neighbours that the greatest encouragement to litigation is uncertainty. When that condition prevails, a reference to a court of law assumes the attractive character of a gambling transaction. The worst possible cause has a chance of winning. The increase of

এই আশা-কুহকিনীর লীলাভূমি। সে বাদী-প্রতিবাদীর কাণে কাণে বলিতে থাকে—

"তুমি মুনসেফ্ কোর্টে মোকদ্দমা হারিয়াছ বটে। তোমার মোকদ্দমায় জোর নাই, একথাও ঠিক। কিন্তু কোন্ মোকদ্দমার ফল কোন্ আদালতে কি দাঁড়ায়, কেহ বলিতে পারে না। হয় ত সব্‌জজের আদালতে আপিল করিলে তুমি জয়লাভ করিতে পারিবে। এই সব্‌জজ্ বিশেষ নজীরপ্রিয় ও ভালমানুষ। বড় উকিলের দ্বারা মাম্‌লা চালাইলে তোমার আপিলের খুব সম্ভবতঃ সুবিধা হইবে। কিন্তু এইরূপে প্রথম আপিলে তোমার জয়লাভ হইলেও, অপরপক্ষ হাইকোর্টে আপিল করিতে চেষ্টা করিবে। হয় ত সেখানে তাহার আপিল ল-পয়েণ্টের অভাবে মঞ্জুরই হইবে না। আর যদি সেখানে তাহার আপিল দায়ের হয় ও মঞ্জুর হয়, তাহা হইলে তুমি যদি তদ্বির করিয়া তোমার মোকদ্দমা জষ্টিস্ মেরি-ম্যানের বেঞ্চে লইয়া যাইতে পার, তাহা হইলে তোমারই জয়-লাভের সম্ভাবনা। কারণ, মেরিম্যান সাহেব বিশেষ অবিচার না দেখিলে সব্‌জজের রায়ই বাহাল রাখিয়া থাকেন। আর যদিই তোমার তদ্বির ও অদৃষ্টের দোষে হাইকোর্টে তোমার পাকা

---

litigation in India is a portentous feature. 'In 1877 the tribunals of British India had to deal with 1,400,000 suits; in 1901 the total number of suits was 2,200,000. Nor are these large figures due to litigants receiving encouragement in the shape of facility and cheapness of procedure'. On the contrary fees are inordinately high; but the fact does not counterbalance the fascination of a game in which everyone hopes to win".—IGNOTUS in *The Asiatic Review*, May, 1914.

ঘুঁটি কাঁচিয়া যায়, তাহা হইলে হয় ত Remand অর্থাৎ কেঁচে গণ্ডূষ, আর না হয় ফুলবেঞ্চ। আর যদি তোমার সেখানে একে-বারে হারই হয়, তাহা হইলে প্রিভি কাউন্সিলে তোমার জিত কেহ আটকাইতে পারিবে না। সেখানে ইংলিশ ল'র অধিক খাতির। ইংলিস ল ধরিয়া সূক্ষ্ম বিচার হইলে তোমার মোক-দ্দমার মার নাই। আর প্রিভি কাউন্সিলে আজকাল হাইকোর্টের অনেক রায় উল্টাইয়া যায়।"

সত্যযুগে মহর্ষি বাল্মিকীর কণ্ঠে সরস্বতী ভর করিয়াছিলেন। কলিকালে বাগ্দেবী আশা-কুহকিনীরূপে ব্যবহারাজীবদিগের কণ্ঠে ভর করিয়া বসিয়াছেন। কোন মক্কেলেরই তাঁহাদের বাক্যজাল ছিঁড়িয়া পলায়ন করিবার সাধ্য নাই।

ঈশ্বর যে-সকল আইন করিয়াছেন, তাহা নাকি স্বর্গে ও নরকে চলিয়া থাকে,—তাহা ইহলোকে চলিবার যোগ্য নয়। শুনিয়াছি, ঈশ্বরের আইন পালন না করিলে অধর্ম্ম হয় ও তাহাতে পরলোকে দুঃখ পাইতে হয়। কিন্তু এখানকার আদালতের আইন অমান্য করিলে হাতে হাতে কারাদণ্ড। আমার মনে হয়, ঈশ্বরের ক্রমোন্নতি (Evolution) বন্ধ হইয়া যাওয়ায়, তাঁহার কৃত আইন-গুলিরও পরিবর্ত্তন বন্ধ হইয়া গিয়াছে; সুতরাং তাহাদের জীবনীশক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে; কিন্তু মনুষ্যকৃত আইন এই দোষে দূষিত হয় নাই। তাহা নিত্য পরিবর্ত্তনশীল, এবং তাহার গায়ে ক্রমোন্নতির ষ্ট্যাম্প মারা আছে। পূর্ব্বে জাল করার অপ-রাধে নন্দকুমারের ফাঁসি হইয়াছিল। এখন সে অপরাধে সে দণ্ড হয় না। মানুষের আইন নিত্য বদলাইয়া যাইতেছে।

আর, এই আইন ধরিয়া বিচার করিবার লোকও অসংখ্য

ইহারা স্ব স্ব রুচি ও প্রকৃতিভেদে একই আইনের ভিন্ন ভিন্ন Interpretation বা ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। কেহ বা বেগুণ চোরের ছয় মাসের কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করেন; আবার কেহ বা হত্যাকারীকে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া গেল না বলিয়া বেকসুর খালাস দেন। বর্ণবৈচিত্র্যে যেরূপ স্বভাবের সৌন্দর্য্য বাড়িয়া যায়, এই বিচারবৈচিত্র্যে সেইরূপ মনুষ্যকৃত আইনের মহিমা ও গৌরব বৃদ্ধি পায়; এবং স্বনামধন্য ব্যবহারজীবিগণ এ কার্য্যের সহায় ও নিমিত্তস্বরূপ হইয়া ধন্য হইয়া থাকেন। সামান্য মোক্তার যেখানে আসামীকে খালাস করিতে অসমর্থ, বড় আদালতের বড় উকিল হয় ত সেই মোকদ্দমা একেবারে উড়াইয়া দিয়া ফরিয়াদীকে উল্টে ২১১ ধারায় ফিড়কী কলে ফেলিতে সক্ষম হইবেন।

এবম্বিধ অঘটনঘটনপটীয়ান্ ব্যবহারাজীবদিগের নিশ্চয়ই ঈশ্বরাংশে জন্ম। ইহারা সভ্যদেশের আইন-আদালতের অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গবিশেব। পূর্ব্বকালের মগের মুল্লুকে ইহাদিগের অস্তিত্ব ছিল না বলিয়া 'মগের মুল্লুক' অবিচারের প্রতিশব্দ হইয়াছিল। এক্ষণকার মগদিগের অদৃষ্ট ফিরিয়াছে। তাহাদের দেশে এখন সভ্যতার অইন-আদালত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং নজীরের গ্রন্থ পর্ব্বতাকারে সজ্জিত হইয়াছে। অনেক নূতন ব্যবহারজীবী নূতন গোচারণক্ষেত্রের অন্বেষণে অধুনা রেঙ্গুনাভিমুখে গমন করিতেছেন। মগের মুল্লুকে আইনের প্যাঁচ কসিতে পারিলে তাঁহাদিগের নসীব খুলিয়া যাইতে পারে। যেহেতু, হাল আইনের দায়ভাগ অনুসারে আইন-ব্যবসায়িগণই বাদী-প্রতিবাদীর সমুদায় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। গল্প শুনিয়াছি, দুই জমীদার

সরিকের মধ্যে মালিকান্ স্বত্ব লইয়া তুমুল মাম্‌লা বাধিয়াছিল। একপক্ষে ব্যারিষ্টার ইভান্স্ সাহেব, ও অপরপক্ষে এড্‌ভোকেট্ জেনারেল্ পল্ সাহেব নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বিচারের সময় হাকিম জানিতে চাহিলেন, বিবাদীয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী কে? ইভান্স্ সাহেব একটু হাসিয়া উত্তর করিলেন, "হুজুর! যদি এই মোকদ্দমা কিছুকাল চলে, তাহা হইলে পল্ সাহেব ও আমিই ইহার উত্তরাধিকারী।"

ব্যবহারজীবিগণ ধর্ম্মাধিকরণের স্তম্ভস্বরূপ হইলেও কর্ত্তৃপক্ষদিগের কেহ কেহ ইঁহাদিগকে সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া থাকেন। তাঁহারা অনুমান করেন যে, দেশীয় বহুতর ব্যবহারজীবীর মধ্যে দ্রোহীভাব প্রচ্ছন্নভাবে লুক্কায়িত আছে। এটি তাঁহাদের বড়ই ভুল। আইন আদালতের কৃপায় দেশের সকল অর্থ উকিল-ব্যারিষ্টারদিগের জালে আসিয়া পড়িতেছে। সুতরাং তাঁহারা কায়-মনোবাক্যে আইন আদালতের স্থায়িত্ব কামনা না করিয়া পারেন না। পশারহীন নূতন আইন-ব্যবসায়ী যখন নাম কিনিবার জন্য প্রথম প্রথম 'স্বদেশী' মোকদ্দমা করিতে থাকেন, তখন সরকারের উপর তাঁহার অধিক ভক্তি না থাকিতে পারে। কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যখন তাঁহার বিশেষ অর্থাগম হইতে থাকে, তখন নিশ্চয়ই তাঁহার আভ্যন্তরিক পরিবর্ত্তন ঘটে। আদালতের মধ্যে নিত্য এগারটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত "Your Honour," My Lord" প্রভৃতি ভক্তিউদ্রেককারী বাক্যের আবৃত্তি করিবার সঙ্গে সঙ্গে, সরকারী সিক্কা টাকা, নোট ও কোম্পানির কাগজের প্রতি আসক্তি জন্মাইতে থাকে, এবং এই আসক্তি ক্রমে আধেয় হইতে আধারে গিয়া বর্ত্তে। কৃতী ব্যবহারজীবিগণের পক্ষে

'স্বদেশী' হচ্ছে রাজভক্তির প্রথম সোপান। তঁহারা বিলক্ষণ বুঝেন যে, যতদিন আইনের রাজত্ব থাকিবে, ততদিন সমাজের উপর তাঁহাদের রাজত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিবে—ততদিন 'উকিল রাজ' অটল থাকিবে। সুতরাং ব্যবহারজীবিগণ কিছুতেই রাজদ্রোহী হইতে পারেন না। তবে তাঁহারা বৈধ পথে কর্ত্তৃপক্ষদিগের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে যে রাজনৈতিক কলহ করেন, তাহা পুরুষের সঙ্গে স্ত্রীর কলহের অনুরূপ। মানভঞ্জনেই তাহার অন্ত হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

গুরু ও গেরুয়া

রক্ত বস্ত্রের প্রতি সারমেয় জাতির বিশেষ ভক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ লাল কাপড় পরিয়া বাহির হইলে পথের কুকুরগুলি তাহার পিছু পিছু আসিতে থাকে। গৈরিক বস্ত্রের উপর আমাদিগেরও এইরূপ একটা অমানুষিক ভক্তি দৃষ্ট হয়। কোন ভস্মমাখা গৈরিকধারী ব্যক্তি লোকালয়ের নিকটে আসিয়া আসন গাড়িয়া বসিলে, আমরা দলে দলে তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া, তাহার চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া, তাহাকে 'বাবাজী', 'গুরুদেব' ও 'গুরুজী মহারাজ' সম্বোধন করিয়া কৃতার্থ হই। আমরা একপ্রকার গেরুয়ার কুকুর।

গেরুয়াধারী বাবাজী নিশ্চয়ই একজন ত্যাগী মহাপুরুষ। সংসারের কোন ভোগ্য বস্তুতে তাঁহার আসক্তি থাকিতে পারে না। আমরা যে তাঁহার মুখে নানাবিধ ভোক্ষ্য, ভোজ্য, লেহ্য, পেয় তুলিয়া দেই, সেটা কেবল আমাদের নিজের পুণ্য ও পরিতৃপ্তির জন্য,—মহাপুরুষ তাহা মলমূত্ররূপে নিজ কলেবর হইতে নিশ্চয়ই বাহির করিয়া দেন। গোয়ালা যেরূপ বুদ্ধিকৌশলে ফুঁকা দিয়া গরুর দুধ বাহির করিয়া লয়, আমরা তদ্রূপ এই গেরুয়া-পরা এঁড়ে গরুর মস্তকের মধ্যে গঞ্জিকাধূমের ফুঁকা দিয়া টানিয়া দুহিয়া তত্ত্ব-জ্ঞানরূপ দুগ্ধ বাহির করিয়া লই। সুরা ইতরসাধারণের নিকট

নিষিদ্ধ মাদক দ্রব্য হইতে পারে। কিন্তু ত্রিগুণরহিতের পথে বিচরণকারী এই সকল মহাপুরুষের নিকট তাহা বিশুদ্ধ কারণবারি ; তদ্ব্যতিরেকে কোন কার্য্যই নিষ্পন্ন হইবে না। ইঁহাদিগের ভাণ্ডারে আমরা যে অর্থ দান করি, তাহাতে একদিকে আমাদের 'কদর্থের' যেমন সদ্গতি হয়, অপরদিকে তদ্দ্বারা অনেক মঠ নির্ম্মিত হইয়া তন্মধ্যে বহুতর গৈরিকধারী নিষ্কাম কর্ম্মবীর নিখরচায় জগতের হিতচিন্তায় হাই তুলিয়া হেলায় কালাতিপাত করিবার সুযোগ পান।

আমার পিতামহের মুখে গল্প শুনিয়াছিলাম, আমাদের পাড়ায় নরহরি চক্রবর্ত্তী নামে এক ভাগ্যবান্ পুরুষ ছিলেন। তিনি সহোদরের সঙ্গে আধ কাঠা জমী লইয়া দীর্ঘকাল মাম্‌লা চালাইয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন। তৎপরেই তাঁহার স্ত্রীবিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে দিব্যজ্ঞানের উদয় হয়। তিনি বুঝিলেন, ধন জন যৌবন নিতান্তই অনিত্য, সংসারের তুল্য বন্ধন নাই, মানুষ বিষয়মদে মত্ত হইয়া পরমার্থতত্ত্ব ভুলিয়া যায়, নিবৃত্তিই হিন্দুর পক্ষে শাস্ত্রানুমোদিত প্রকৃষ্ট পথ। তাঁহার প্রাণে বৈরাগ্যের আগুন ধুঁধু করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। আর তাঁহাকে আটকাইয়া রাখে কে? তিনি একটি ছালার মধ্যে আবশ্যকমত তৈজসপত্রাদি সংগ্রহ করিলেন, কামারশাল হইতে একটি ত্রিশূল গড়াইয়া আনিলেন, এবং গেরিমাটিতে কাপড় ছোপাইলেন। তৎপরে একদিন নিশীথ সময়ে তাঁহার ভগ্ন কুটীরাভ্যন্তরে নিদ্রিত পঞ্চমবর্ষীয় শিশুর মায়া কাটাইয়া দ্বিতীয় সিদ্ধার্থের ন্যায় গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

প্রায় বিশ বৎসর যাবৎ কেহ তাঁহার কোন সংবাদ পাইল

না। পরে শুনা গেল, তিনি ৺কাশীধামে এক প্রকাণ্ড আশ্রম খুলিয়া অচ্যুতানন্দ স্বামী নামে সগৌরবে বিরাজ করিতেছেন। অনেক পুণ্য ও যশোলিপ্সু রাজা মহারাজা এই আশ্রমে নাকি প্রভূত অর্থ দান করিতেন। অচ্যুতানন্দ মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইলে, তাঁহার বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্র পিতৃ-আদেশে আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছিল; এবং তাহার পিতৃদেবের কলেবর রক্ষার পর বিশ হাজার টাকার পিতৃধনের মালিক হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়া থিয়েটারের দল করিয়াছিল। শুনা যায়, যে সেবাদাসী রাত্রে স্বামীজীর পদসেবা করিয়া ধন্যা হইত, তাহার গর্ভজাত এক কন্যা স্বামীজী-দত্ত অর্থে সোণাগাছীতে ব্যবসাপত্তন করিয়া, তাহার উপস্বত্ব হইতে তিনখানি অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া মালিকান স্বত্ত্বে অদ্যাবধি তাহা ভোগদখল করিয়া আসিতেছে।

পূর্ব্ব হইতেই গৈরিকের উপর আমার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। এক্ষণে ঠাকুরদাদার মুখে এই গল্প শুনিয়া আমার সেই ভক্তি চতুর্গুণ বাড়িয়া গেল। মনে মনে বলিলাম, ধন্য গৈরিক! তুমিই মানবের ইহ-পরকালের একমাত্র সম্বল। আমি সেইদিন হইতে সন্ন্যাসীর অনুসন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। গৈরিকধারী দেখিলেই মনে করিতাম, তাহার ভিতরে নিশ্চয়ই প্রকৃত বস্তু আছে; এবং এই বিশ্বাসে চিটা গুড়ে মাছির মত তাহার সঙ্গে লাগিয়া থাকিতাম। এইরূপে কিছুদিন কাটিয়া গেল। পুণ্যবানের ভাগ্যে বাঞ্ছিত বস্তু মিলিতে অধিক বিলম্ব হয় না। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্যফলে আমারও অল্পদিনের মধ্যে উপযুক্ত গুরুজী মিলিল। তিনি আমাকে চেলা করিয়া লইতে রাজী হইলেন। সুতরাং শীঘ্রই একদিন গুরুজনদিগকে অষ্টরম্ভা প্রদর্শন করিয়া গুরুজীর সঙ্গে

ভাসিয়া পড়িলাম। গুরুশিষ্যে নানাতীর্থ পর্য্যটন করিতে লাগিলাম।

৺কাশীধামে পূর্ব্ববঙ্গের এক 'স্বদেশী' যুবকের সঙ্গে আমার পরিচয় হইল। তিনি আমাকে বলিলেন—"মহাশয়! আপনি ভালই করিয়াছেন। গৈরিকধারী না হইলে যুবকেরা দেশের কাজ করিতে পারিবে না। গেরুয়া ব্যতিরেকে এ পতিত দেশের উদ্ধার হইবে না। আনন্দ মঠের সন্তান সম্প্রদায় এই কারণে গৈরিক ধারণ করিয়াছিল।"

আমি বলিলাম—"আপনি যাহা বলিলেন, তাহা আংশিক ভাবে সত্য। তখন কেবল গৈরিকেই কাজ হইত। এখন কিন্তু গৈরিকের সঙ্গে কিঞ্চিত গঞ্জিকা যোগ করিতে হইবে। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, এদেশের বিদ্যালয়সমূহে ছাত্রদিগকে গৈরিকধারণ ও গঞ্জিকা-সেবনের উপকারিতা সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হয় না। একারণে তাহারা বিদ্যাশিক্ষার্থে বিদেশ গমন করিয়া হ্যাট্ কোট্ ধারণ ও সিগারেট্ সেবন করিয়া অত্যন্ত উন্মার্গগামী হইতেছে। বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষদিগের ভ্রূকুটিতেও তাহারা বাগ মানিতেছে না। এই সকল বহির্মুখী ধর্ম্মভ্রষ্ট যুবকবৃন্দ যতদিন না দেশে ফিরিয়া গেরুয়া ও গঞ্জিকার স্মরণাগত হইতেছে, ততদিন তাহাদের দ্বারা দেশের কিছুই কাজ হইবে না। তাহারা অন্ততঃ গেরুসার কোট্ প্যাণ্ট্ ও গঞ্জিকার বিড়ি ব্যবহার করিলেও অনেকটা স্বধর্ম্মপালন করিতে সক্ষম হইবে। বড়ই সুখের বিষয়, এ দেশের বিদ্যালয়গুলিতে ধর্ম্মমূলক শিক্ষা দিবার কথা চলিতেছে।"

যুবকটি আমার কথার যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিয়া শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিলেন, এবং আমাকে এতৎ সম্বন্ধে

একখানি পুস্তিকা প্রণয়ন করিতে অনুরোধ করিয়া বিদায় হইলেন।

একদিন গুরুদেবের সঙ্গে আমার ধর্ম্ম ও সাধনা সম্বন্ধে কিছু কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। তিনি মৃৎপ্রস্তরনির্ম্মিত পুত্তলিকা পূজার ঘোর বিরোধী ছিলেন। একদিন তিনি বলিলেন, "পাথর পূজ্‌নে হার মিলে ত মে পূজে পাহাড়।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তবে কোন্ দেবতার পূজা করিতে আজ্ঞা করেন?"

তিনি বলিলেন, "রজতরূপী দেবতার পূজা কর। শাস্ত্রে শঙ্করকে 'রজতগিরিনিভং' বলেছে। অতএব রজতগিরির ধ্যান করিলেই দেবাদিদেবের ধ্যান করা হবে। কলৌ চাঁদি! কলৌ চাঁদি! কলিকালে এই দেবতার প্রতি ভক্তি থাকিলেই জীবের মুক্তি হবে।"

আমি পরে অবগত হইয়াছিলাম, তিনি এই দেবতার একাগ্র সাধনা করিয়া অষ্টসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এই সিদ্ধিবলে গুরুদেব এক ধাতুকে অন্য মহার্ঘ ধাতুবিশেষে পরিণত করিতে পারিতেন; এবং তজ্জন্য আবশ্যক হইলে ইচ্ছামাত্র সূক্ষ্মদেহ পরিগ্রহ করিয়া আপনাকে লোক-লোচনের অন্তরালে অদৃশ্য করিতে পারিতেন। আমি নিজে তাঁহার এই ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

এক সময়ে আমরা গুরুশিষ্যে পশ্চিমাঞ্চলের কোন দেহাতে এক ধনী জমীদারের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলাম। গৃহস্বামী অত্যন্ত ভক্তি সহকারে গুরুদেবকে ধরিয়া বসিল, তাহার ঘরে কিছু তামা আছে, তাহাকে সোণা করিয়া দিতে হইবে। স্বয়ং ভগবানই ভক্তাধীন। গুরুদেবও ভক্তের পীড়াপীড়িতে অগত্যা যথাসম্ভব গোপনভাবে একার্য্য করিতে স্বীকৃত হইলেন।

অষ্টাহব্যাপী আয়োজনের পর এক নিভৃত উদ্যানমধ্যে একটি বিরাট যজ্ঞ আরব্ধ হইল। প্রজ্জ্বলিত হোমকুণ্ডের মধ্যে মৃৎপ্রলেপ-যুক্ত মৃৎপাত্রে দশ সের পরিমিত তাম্রখণ্ড যথাসংস্কারে সংরক্ষিত হইল। প্রত্যহ অষ্টপ্রহরব্যাপী পূজা, পাঠ, হোম এবং মধ্যে মধ্যে ঘণ্টানাড়া চলিতে লাগিল। কোন অনুষ্ঠানেরই ত্রুটি হইল না। প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে উনপঞ্চাশ প্রকার উদ্ভিদরসের প্রক্ষেপ বা 'ফুট' দেওয়া হইতে লাগিল। তৃতীয় রাত্রের তৃতীয় প্রহরে দেখা গেল, তাম্র হেমবর্ণ ধারণ করিয়াছে। গুরুদেব অনুমান করিয়া বলিলেন, "চব্বিশ টাকা দরের সোণা দাঁড়াইয়াছে।" গৃহ-স্বামীর আর আনন্দের সীমা রহিল না। পূর্ব্ব অঙ্গীকার অনুযায়ী তৎক্ষণাৎ গুরুজীর পাদপদ্মে পঞ্চসহস্র মুদ্রার দক্ষিণান্ত করা হইল।

তিন দিন তিন রাত্রি কেহ উৎকণ্ঠায় নিদ্রা যাইতে পারে নাই। অতএব গুরুদেবের অনুমতিক্রমে গৃহস্বামী ও তাহার বিশ্বস্ত ভৃত্য একটু শয়ন করিল, এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহাদের নাক ডাকিতে আরম্ভ করিল। গুরুদেব স্বয়ং সিদ্ধ পুরুষ, তাঁহার নিদ্রা ও জাগরণ উভয়ই সমান। তিনি আমাকে বলিলেন যে, প্রভাতে তাঁহার এই বিদ্যার কথা গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া পড়িবে, এবং তাহা হইলে আমাদিগকে কেহই আর এস্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইতে দিবে না। ক্রমে এ সংবাদ সরকার বাহাদুরের কাণে পৌঁছিলে তাঁহারা তাঁহাদ্বারা রাজ্যের সমস্ত তাম্রকে সুবর্ণ করাইয়া লইবেন। তখন সোণার দর আর মাটির দর এক হইয়া যাইবে। অতএব আর আমাদের এখানে তিলার্দ্ধকাল থাকা কর্ত্তব্য নহে। সুতরাং রাত্র প্রভাতের পূর্ব্বেই আমরা অন্তর্দ্ধান

হইলাম। পাছে সরকার সন্ধান পান, এই আশঙ্কায় আমাদিগকে কয়েক মাস নামান্তর পরিগ্রহ করিয়া বিরাটরাজ্যে পাণ্ডবদিগের ন্যায় একটু সতর্কভাবে অবস্থান করিতে হইয়াছিল।

এই ঘটনার কিছুকাল পরে আর একস্থানে এক গৃহস্থের বাটীতে তাম্র হইতে স্বর্ণ প্রস্তুত করিবার জন্য আমরা সাদরে নিমন্ত্রিত হইলাম। সাবধান সত্তেও আমাদিগের আবির্ভাব-সংবাদ কোন গতিকে কোতোয়ালীতে পৌঁছিল। সুতরাং অনতিকাল মধ্যে দারোগা সাহেব আসিয়া "পাঁও লাগি মহারাজ!" বলিয়া গুরুদেবের চরণবন্দনা করিলেন। দেখিলাম, তিনি একজন বিশেষ ভক্ত ও জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তি। কৌতূহলপরবশ হইয়া দারোগা সাহেব আমাদের তৈজসপত্রাদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিদর্শন করিতে লাগিলেন, এবং প্রত্যেক বস্তু সম্বন্ধে নানাবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। আমি যে বাঙ্গালী তাহা অবগত হইয়া তিনি নিরতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন, "বাঙ্গালীদের বড়ই এলেম্ আছে। তাহাদের উপর সরকারের বড়ই নেক নজর।" আমার তল্পির মধ্যে এক টুক্‌রা কাগজে জড়িত কিছু হরিতাল-ভস্ম ছিল। দারোগা সাহেব তাহা খুলিয়া দেখিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি এ?"

আমি বলিলাম—"এ একটি আশ্চর্য্য মহৌষধ, ইহাদ্বারা অসংখ্য রোগ আরোগ্য করা যাইতে পারে।"

দারোগা সাহেব বলিলেন—"তা'হোলে এ যে খুব তেজী মসলা তার আর সন্দেহ নাই।"

স্বদেশী আন্দোলনের কথা পাড়িয়া তিনি বলিলেন—"শুনেছি, বাঙ্গালীবাবুরা নাকি স্বদেশী করিতে করিতেই বোমা তৈয়ার করিতে

শিখেছে। আপনাদের জন্যই আমাদের কাজ আর তলব বাড়িয়া গিয়াছে।”

এই কথা বলিয়া দারোগা সাহেব হরিতাল-ভস্মের প্যাকেট্‌টি হাতে করিয়া লইয়া বলিলেন—“আমি ইহা লইয়া যাইব। আমার স্ত্রীর মূর্চ্ছাগত রোগ আছে। হাকিমকে দেখাইব, যদি এই ঔষধে উপকার হয়।”

আমি তাঁহাকে একটু ভস্ম স্বতন্ত্র মোড়ক করিয়া দিতে চাহিলাম। তিনি বলিলেন—“না, মিছামিছি এখন আলাহিদা মোড়ক করিবার আবশ্যক নাই। হাকিমকে দেখাইয়া যদি আবশ্যক না হয়, তা'হলে সমস্ত ফিরাইয়া দিব।”

আমরা আরও পাঁচ সাত দিন এখানে থাকিব শুনিয়া তিনি বিদায় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার লোক নিয়ত আমাদের কাছে থাকিয়া, নানাবিধ সদালাপ করিয়া, এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সর্ব্বদা আমাদের খবরাখবর লইয়া আমাদিগকে আপ্যায়িত করিত। এ অবস্থায় গুরুজীকে অত্যন্ত অনিচ্ছায় সুবর্ণ-প্রস্তুতের সুবর্ণ-সুযোগ পরিত্যাগ করিতে হইল। ‘শ্রেয়াংসি বহবো বিঘ্নাঃ।’ চারদিন পরে দারোগা সাহেব পুনরাগমন কয়িয়া ধন্যবাদের সহিত আমার মোড়ক ফিরাইয়া দিলেন। আমার বোধ হইল তন্মধ্যস্থ হরিতাল-ভস্মের কিয়দংশ অন্তর্হিত হইয়াছে। দারোগা সাহেব একজন রাজপুরুষ, অতএব নিশ্চয়ই রাজনীতিবিশারদ। তাঁহার তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক দৃষ্টি ক্ষতস্থানে মক্ষিকার মত সতত আমার উপর সংন্যস্ত থাকায়, তাহা গুরুদেবের ধাতুপরিবর্ত্তক বিদ্যার ভেদ মারিতে পারিল না। যাহা হউক, তিনি অতি সদাশয় লোক। তাঁহার অনুচরবর্গ যাত্রাকালে আমাদিগকে ষ্টেশন পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া

দিয়াছিল; এবং আমার বক্রদৃষ্টিতে এরূপ অনুভূতি হইল যেন তাহাদের মধ্যে একজন ট্রেণ ছাড়িবার সময় একখানা গাড়ীতে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল—বুঝি সে সহজে আমাদের মায়া কাটাইতে পারিল না।

অতঃপর গুরুজীর সঙ্গে যে যে স্থানে গিয়াছিলাম, তাহার সর্ব্বত্রই কোতোয়ালীর দৃষ্টি আমার উপর ওতপ্রোত ভাবে পরিলক্ষিত হইত। কিছুদিন পরে গুরুদেব একদিন আমাকে নির্জ্জনে ডাকিয়া বলিলেন—"বাবা! তুমি বাঙ্গালী। তোমার মত চেলা সঙ্গে থাকিলে আমাকে ব্যবসা বন্ধ করিতে হবে। তুমি ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া যাও। আজ থেকে আমার বরে তুমি সকল বিদ্যার পারদর্শী হ'লে।" আমি বুঝিলাম বাঙ্গালীর আর গেরুয়ার মজা নাই। সে তাহার জাতিগত স্বাদেশিক পাপ গেরুয়ায় ঢাকিয়া যে তীর্থে তাহা ধৌত করিতে গমন করিবে, সেইখান হইতেই কলির কালভৈরব তাহাকে তাড়াইয়া দিবে।

অগত্যা আমি গেরুয়া সম্বন্ধে বিশেষ বহুদর্শিতা লাভ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিলাম। গৃহীর পক্ষে গৈরিক নিষিদ্ধ; সুতরাং আমাকে তাহা অনিচ্ছাসত্ত্বেও পরিত্যাগ করিতে হইল। এজন্য আমার একজন বন্ধু আমাকে বিদ্রূপ করিতে আরম্ভ করিলেন। আমি বুঝিলাম, তিনি গৈরিক ও গুরুবাদের ঘোর বিদ্বেষী। একদিন তাঁহার সহিত এ সম্বন্ধে আমার কিঞ্চিৎ বাদানুবাদ হইয়াছিল। তিনি বলিলেন, একলক্ষ গৈরিকধারী সন্ন্যাসীর মধ্যে একটিও খাঁটি লোক পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। তিনি স্বীকার করেন যে, দয়ানন্দ ও বিবেকানন্দের মত দু'চারজন গৈরিকধারী ব্যক্তি দেশের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মতে, এই

সকল মহাপুরুষ যদি গেরুয়া ধারণ না করিয়া ঐ কার্য্য করিতেন, তাহা হইলেই ভাল হইত। কারণ, তাহা হইলে তাঁহাদের দৃষ্টান্তের দোহাই দিয়া ধর্ম্মের বাজারে এত মেকি চলন হইতে পারিত না। বন্ধুবর দেখাইলেন যে, রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন ও রামকৃষ্ণ পরমহংসকে গৈরিকের ভেক ধারণ করিতে হয় নাই। তাঁহার মতে, দেশে যেরূপ গৈরিকের বিরাট প্রতারণা আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে এখন আমাদের গৈরিক-ধারী দেখিবামাত্র তাহাকে কুলার বাতাস দিয়া বিদায় করা কর্ত্তব্য। ইহাতে দুষ্ট গরুর সঙ্গে দু'চারটি কপিলা গরুর নিগ্রহ হইবে সত্য; কিন্তু উপায় নাই। হাজার হাজার অপরাধীর সঙ্গে দু'চারজন নিরপরাধীকেও দণ্ড লইতে হয়। বন্ধুবর বলিলেন—"গৈরিকের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিবাদের সময় আসিয়াছে। এখন গেরুয়ার প্রতিকূলে Reaction আবশ্যক। আর, গুরুবাদ হইতে গেরুয়া প্রশ্রয় পাইয়া থাকে। গুরুর পায়ে মাথা নোয়াইয়া নোয়াইয়া ভারতবাসীর মেরুদণ্ড বাঁকিয়া গিয়াছে। তাই তাহারা আর মাথা তুলিয়া সোজা হইয়া চলিতে পারে না। অতএব গেরুয়ার সঙ্গে গুরুবাদকেও বিতাড়িত করিতে হইবে।"

পুণ্যভূমি ভারতের হিন্দুসন্তানের মুখে এই সকল বেল্লিকতন্ত্রের কথা শুনিয়া আমার আক্কেল্ গুড়ুম হইল। মনে বুঝিয়া দেখিলাম, বন্ধুবরের এই সকল তর্কযুক্তি নিতান্ত অন্তঃসারশূন্য। হিন্দুজাতির গুরু না থাকিলে চলিবে না। বুদ্ধিমান কর্ত্তৃপক্ষগণ যে আমাদের জন্য শিশুপথ্যের ব্যবস্থা করেন, তাহার কি কোন সঙ্গত কারণ নাই? নিশ্চয়ই আছে।

গোপজাতি আশি বৎসরের কমে সাবালক হয় না। আমরা

ভারতবর্ষের অত্যন্ত প্রাচীন জাতি। হাজার হাজার বৎসরেও আমাদের নাবালকত্ব ঘুচিল না। ভগবান ভারতবাসীকে ভুলক্রমে আজীবন অপগণ্ড শিশু করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহার দীক্ষাগুরু তাহাকে আমরণ হাতে ধরিয়া না চালাইলে, সে নিজের গন্তব্যপথে এক পাও চলিতে পারে না। গুরুদেব আসিয়া তাহার সহধর্ম্মিণীর কাণে মন্ত্র ফুঁকিয়া না দিলে তাহার হাতের জল শুদ্ধ হইবে না। যে বাজারের বারবনিতা, তাহারও একটি গুরু থাকা নিতান্ত আবশ্যক; নচেৎ অন্তিমে তাহার পাপ-সম্ভব সম্পত্তির সদ্গতি করিবে কে? স্কুল, কলেজ ও অনাথ আশ্রমের দরিয়ায় এ যক্ষের ধন ডুবাইয়া দিলে কি হইবে? জল যেমন সমুদ্র হইতে মেঘরূপে ঊর্দ্ধে উঠিয়া বৃষ্টিরূপে পতিত হইয়া নদনদী দিয়া পুনরায় সমুদ্রে প্রত্যাবর্ত্তন করে, সেইরূপ বেওয়ারিস কামিনীর কাঞ্চন একবার গুরুমন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া গুরুর বংশধরদিগের মারফতে আবার যথাকালে কামিনীর খর্পরে ফিরিয়া যায়। ইহাতে যেখানকার জল সেইখানেই থাকে, মাঝে থেকে গুরুকুল উদ্ধার হয়। যাহারা শিক্ষিত সমাজের শীর্ষস্থানীয়, তাঁহাদিগেরও স্বদেশী বা বিদেশী গুরুবিশেষের আবশ্যক হয়। তদ্ব্যতিরেকে কে তাঁহাদের নিমীলিত নেত্র জ্ঞানাঞ্জন শলাকার দ্বারা উন্মীলিত করিয়া দিবে? তাই ব্রাহ্মসমাজেও সম্প্রতি গুরুবাদ চল হইতে সুরু করিয়াছে।

ভারতবর্ষের মাটির গুণ আছে। গুরুবাদ, অবতারবাদ ও পৌত্তলিকতা এদেশের মাটিতে আপনিই গজাইয়া উঠে; সেজন্য চাষ আবাদ করিতে হয় না। গুরুবাদ ও পৌত্তলিকতা একই বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন রূপান্তরমাত্র। গুরু হচ্ছেন রক্ত-মাংস-মেধ-মজ্জাময়

বিগ্রহবিশেষ। প্রস্তরমৃত্তিকাময় বিগ্রহের ন্যায় এই রক্তমাংসময় বিগ্রহও ঠাকুরঘরের সিংহাসনে বসিবার হক্‌দার হইতেছেন। দেশের ছোটবড়লোক যতদিন এই দেবতার পূজা যোগাইবে, ততদিন ইনি জাগ্রত থাকিবেন। যে দেশে গৈরিক ধারণ করিলে সহজে রাজভোগ ও দেবসম্মান মিলে, সে দেশের বুদ্ধিজীবী ব্যক্তির পক্ষে গেরুয়া পরিয়া গুরুজী বনিবার আকাঙ্ক্ষা অবশ্যই সঙ্গত।

আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, বাসুকীর ফণার উপরে বসুমতীর ন্যায় বিরাট হিন্দুসমাজ এই গুরুবাদের উপর ভর দিয়া শান্ত ও নিতান্ত নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করিতেছে। যে দিন গুরুবাদ খসিয়া যাইবে, সে দিন রাষ্ট্রব্যাপী ভীষণ সামাজিক ভূকম্পন সংঘটিত হইবে, এবং তাহাতে অনেক অভ্রভেদী প্রাচীন প্রাসাদচূড়া ভূমিসাৎ হইবে। গুরুবাদ আমাদের বিবেক ও ব্যক্তিত্বকে চাপিয়া রাখিয়াছে। বিবেক ও ব্যক্তিত্বের সমবায়ে অহংজ্ঞানের উন্মেষ হয়। অহঙ্কারের তুল্য রিপু নাই। সুতরাং গুরুবাদ আমাদের স্কন্ধে চাপিয়া আমাদের শত্রু নিপাত করিতেছে। এই গুরুবাদ অপসারিত হইলে আমাদের বিবেক ও ব্যক্তিত্ব আবার মাথা কাড়া দিবে, এবং তখন হয় ত আমরা অহংজ্ঞানে মত্ত হইয়া পাশ্চাত্যজাতির সঙ্গে সমস্বরে বলিয়া উঠিব—

Sovereignty of Reason has been proclaimed. No more blind obedience. The day of human idolatry is past and gone. We shall no longer bow our head to any idol either of clay, or of flesh and blood.

কি সর্ব্বনাশ! Reason কি অভ্রান্ত? Reason কি সকলের এক? ব্যক্তিগত জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেচনার উপরে সমাজ চলিতে পারে

না। সমাজকে চলিতে হইবে অন্ধের ন্যায় গুরুনির্দ্দিষ্ট পথে। সকল শিয়ালের যেমন এক রা, সেইরূপ সকল গুরুই এক বাক্যে নিবৃত্তিমার্গ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। আমরা যে নিবৃত্তিমার্গ-গামী প্রাচ্যজাতি। ত্যাগ ও সংযম যে আমাদের জীবনের মূল-মন্ত্র। আমরা পুরুষানুক্রমে প্রবৃত্তিকে নিম্নস্থান এবং নিবৃত্তিকে উচ্চস্থান দিয়া আসিয়াছি। পিপাসা দমন কর, আকাঙ্ক্ষা সংযত কর, বিষয়ে নিরাসক্ত হও; তাহা হইলেই তুমি মোক্ষপদ লাভ করিবে। ইহাই হইল আমাদের প্রতি শাস্ত্রের উপদেশ। আমরা ভোগ্যবস্তু লাভে যেরূপ ব্যর্থকাম হইয়া পড়িয়াছি, তাহাতে এই উপদেশই আমাদের পক্ষে বিশেষ সান্ত্বনাপ্রদ।

কেহ হয় ত বলিবেন, এই উপদেশ আমাদের পুরুষকারকে সঙ্কুচিত করে এবং উদ্যমকে পদে পদে দমিত করে। আমি বলি, পুরুষকার ও উদ্যমে আমাদের আবশ্যক কি? কুরু-ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, ফলপ্রত্যাশা রহিত হইয়া কর্ম্ম করিতে হইবে। কুরুক্ষেত্র ত বহুদিন হইল ঘুচিয়া গিয়াছে। এখন ফলপ্রত্যাশায় জন্মের মত জলাঞ্জলি দিয়া কর্ম্মনাশায় অবগাহন করিলে ক্ষতি কি? কর্ম্মের মধ্যে ত পঁচিশ টাকার চাকরি, তাহাতে মাত্র একবেলা পেট চলে। মুনিঋষিগণ বায়ুভক্ষণ করিয়া দিন কাটাইতেন। আমরা সেই আর্য্যঋষিদিগের সন্তান হইয়া তাহা কেন না পারিব?

সেদিন রামহরি বসুর বড় ছেলে বি, এল্, পাশ করিয়া ওলাউঠায় মারা পড়িল। আমরা সকলে তাহাকে বলিলাম, "তোমার আর দু'টি ছেলেকে লেখাপড়া শিখাইবার চেষ্টা করিও না। ইহাদের আর উকিল হইয়া বড়লোক হইবার আবশ্যক

নাই। ইহারা মূর্খ হইয়া বাঁচিয়া থাক্। জীব দিয়াছেন যিনি, আহার দিবেন তিনি।” বসুজা আমাদের উপদেশ শিরোধার্য্য করিল। তাহার ছেলেদের বাঁচিয়া থাকা আগে দরকার, পরে আবশ্যক হইলে তাহারা বায়ুভক্ষণ করিয়া দিন কাটাইতে পারিবে। পুরুষকার ও উদ্যম দেখাইতে গিয়া হোঁচট্ খাইয়া পৈত্রিক প্রাণ হারাইবার আবশ্যক কি ?

আবার, এদেশের জল-হাওয়া ও উষ্ণতা স্বভাবতঃই দেহের ও মনের অবসাদ আনয়ন করে। গ্রীষ্মকালে এদেশের লোকের পক্ষে ঘরের বাহির হইয়া কাজকর্ম্ম করা অসম্ভব। আমাদের শিক্ষিত লোকেরা মস্তিষ্কের অধিক চালনা করিলে বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হয়। আমার মনে হয়, ভারতবর্ষই বিশিষ্টভাবে নিষ্কর্ম্মভূমি। এ ভূমিতে কোন কাজে পা বাড়াইতে গেলে প্রতি-নিয়ত নিবৃত্তি ও বিধি-নিষেধের হাঁচি টিকৃটিকি পড়িতে থাকে। এখানে দিবসের অষ্টমভাগে যে ব্যক্তি শাকান্নের দ্বারা দগ্ধোদর পূরণ করিবে, সেই সর্ব্বাপেক্ষা সুখী। আমরা অনেকেই তাহা করিতে বাধ্য হই। সুতরাং আমাদের চেয়ে সুখী কে ?

ইহার উপর আমরা সম্পূর্ণ অঋণী ও অপ্রবাসী। আমাদের স্বদেশী ব্যাঙ্কগুলি পটাপট্ ফেল মারিয়াছে; আমাদের বাজার-ক্রেডিট আদৌ নাই, হাত পাতিলে কেহ একটি পয়সা ধার দেয় না। আমাদের মত অঋণী আর কে আছে? আমরা প্রবাস কাহাকে বলে জানি না। নিরীহ ভেকের মত আমরা প্রাচীন ভারতের গভীর জ্ঞানকূপে পড়িয়া “কে কার কড়ি ধারে” বলিয়া চিরদিন গলাবাজী করিয়া আসিতেছি। কূপ-মণ্ডূকের মত অঋণী ও অপ্রবাসী, সুতরাং সুখী আর কে আছে? তাই

ব্রাহ্মণ-সম্মিলনী আমাদের এই সুখের কূপমণ্ডূকত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সমুদ্রযাত্রার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছেন।

তবে সম্প্রতি দগ্ধবিধি আমাদের এই সুখে কিঞ্চিৎ বাদ সাধিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিছুদিন হইল, কতকগুলি বিজাতীয় জীব উদরের চেষ্টায় আমাদের এই কূপের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। স্থান সংকুলান না হওয়ায় অধুনা আমাদের মধ্যে মুষ্টিমেয় ভেক এই কূপ হইতে ছট্‌কে বাহির হইয়া হাঁপ ছাড়িবার আশায় দক্ষিণাফ্রিকা ও কানাডায় গিয়া হাজির হইয়াছে। বাবাজীরা এখন দেখিতেছেন যে, সেখানেও তাহাদের স্থানাভাব। এই সমস্যার মীমাংসা করিতে হইলে ঐ সকল ভারতীয় মণ্ডূককে পুনরায় ভারতকূপে প্রত্যাগমন করিতে হইবে, এবং শীত ঋতুতে ভেকজাতির ন্যায় তাহাদিগকে এইখানেই সমাধিস্থ হইতে হইবে। শুনিয়াছি, এই যোগের অবস্থায় ভেকগণ বায়ুভক্ষণ করিয়া দীর্ঘকাল গর্ত্তের মধ্যে বাস করিতে সক্ষম হয়, এবং তখন তাহাদের ব্যাং-খুঁচুনি করিলে বা ঠ্যাং কাটিয়া দিলেও সাড়া দেয় না।

আমাদের জাতিগতভাবে এইরূপ মৃত্তিকার মধ্যে সমাধিস্থ না হইলে কিছুতেই নির্ব্বাণপ্রাপ্তি ঘটিবে না। নির্ব্বাণই যখন আমাদের চরম লক্ষ্য, তখন আমাদিগকে অবশ্যই গুরুদেবের চরণ-তরি চড়িয়া গেরুয়া সম্বল করিয়া নিবৃত্তির স্রোতে শনৈঃ শনৈঃ ভাসিয়া যাইতে হইবে। পাশ্চাত্যজাতি প্রবৃত্তির বল্গাবিচ্যুত অশ্বারোহণে নিষ্কোষিত অসিহস্তে বিশ্ব-দিগ্বিজয় করিয়া বেড়াক্। আমরা সংস্কৃতভাষায় নানালঙ্কারপূর্ণ শ্লোক রচনা করিয়া তাহাদিগের তুরঙ্গম ও বীরবেশের বর্ণনা করিতে থাকিব। তাহাদের শৌর্য্যবীর্য্য ও সুখৈশ্বর্য্য দেখিয়া আমাদের ঈর্ষান্বিত হইবার কারণ

নাই। প্রবৃত্তির প্রজ্জ্বলিত শিখায় উড়িয়া পড়িয়া পুড়িয়া মরিবার জন্য পাশ্চাত্য পতঙ্গের উৎপত্তি হইয়াছে। আর দেহের মধ্যে হস্ত-পদাদি সঙ্কুচিত করিয়া সংযম-সলিলে আজন্ম নিমজ্জিত থাকিবার জন্য প্রাচ্য কূর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে।

কিন্তু পাশ্চাত্য জাতি কি নিবৃত্তির হাত একেবারে এড়াইতে পারিয়াছে? তবে তাহারা সিংহাসনের জন্য মৃত্যুমুখে ঝাঁপাইয়া পড়ে কেন? প্রবৃত্তির অনুসরণ করিতে গিয়া তাহারা চরম নিবৃত্তিকে আলিঙ্গন করিতে বাধ্য হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, যেকেহ যে পথই অবলম্বন করুক না কেন, পরিণামে সকলকেই নিবৃত্তির পথে আসিয়া পড়িতে হয়।

ঈশ্বরকৃপায় জগতের অন্যান্য জাতি অপেক্ষা আমরা কিছু অধিক বুদ্ধি ধরিয়া থাকি। সুতরাং আমরা অনর্থক প্রবৃত্তির ভিতর দিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া নিবৃত্তিতে যাইব কেন? আমরা ঢেঁকিশাল দিয়া কটক যাইতে রাজি নহি। তাই যখন পাঠান মোগলেরা এদেশে আসিয়া প্রবৃত্তির গোলকধাঁধায় সাত শত বৎসর ঘুরিয়া মরিতেছিল, আমরা সেই সময়ের মধ্যে কপ্‌নি ও টুকনি সার করিয়া হরিনাম করিতে করিতে সরা-সরি নিবৃত্তির পথ ধরিয়া একেবারে নির্ব্বাণের কাছাকাছি আসিয়া পৌঁছিয়াছি। আর পোয়াটাক্ পথ বাকী আছে মাত্র।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ঋদ্ধি ও সিদ্ধি

অর্থ হচ্ছে আলাদিনের আশ্চর্য্য প্রদীপ। হাতে এই জিনিস যথেষ্ট থাকিলে তুমি যাহা চাহিবে তাহাই পাইবে। তুমি অর্থের অধিপতি হইয়া গোমূর্খ হইলেও বিশ্ববিদ্যালয় তোমাকে ডি, এল্, উপাধি দিয়া আপনাকে গৌরবান্বিত জ্ঞান করিবে। তোমার রচনায় ব্যকরণাশুদ্ধিগুলি সাহিত্যিকদিগের নিকটে এ কালের আর্ষ-প্রয়োগ বা আদর্শ লেখা বলিয়া গৃহীত হইবে। তুমি অনড্বান্ হইলেও অর্থের মাহাত্ম্যে লোকে তোমাকে genius বা প্রতিভার অবতার বলিয়া মানিয়া লইবে। লক্ষ্মীর অনুকম্পায় তোমার গৌরবের অবধি থাকিবে না। তোমার চতুষ্পার্শে অনেক গ্রহ উপগ্রহ আসিয়া জুটিবে, এবং তাহারা তোমাকে কেন্দ্র করিয়া এক নূতন সৌর-জগতের সৃষ্টি করিবে, আর তুমি তাহাদের মধ্যস্থলে মার্ত্তণ্ডরূপে বিরাজ করিতে থাকিবে। বিশ্ববিদ্বেষী চাটুকারগণ তোমাকে ঘিরিয়া তোমার সুরে সুর মিলাইয়া সর্ব্বদা তোমার চিত্তবিনোদন করিবে। তুমি হাই তুলিলে চারিদিক হইতে অসংখ্য তুড়ি পড়িয়া যাইবে। তোমার ধূর্ত্ত আত্মীয়স্বজন তোমাকে পদে পদে প্রতারিত করিতে থাকিবে, কারণ তাহা করিবার তাহাদের অধিকার আছে। ধড়িবাজ লোকে তোমার কৃতী পুত্রকে কাপ্তেন করিয়া তাহার দ্বারা ভূয়া হ্যাণ্ডনোট কাটা-

হবে; এবং তোমার অবিদ্যার মন্দিরে মহা সমারোহে বানরের বিবাহ ও ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ হইবে,—কারণ, অর্থ থাকিলেই তাহা হয়, না থাকিলে নিজের বাপেরও শ্রাদ্ধ হয় না।

বাঁশবাজীকরেরা বাঁশ হাতে লইয়া দড়ির উপর দিয়া চলিবার সময় "হায় রে পয়সা! হায় রে পয়সা!" বলিয়া চীৎকার করিতে থাকে। দুনিয়ার সকল মানুষই বাজীকর। সকলেই নিজ নিজ ফন্দির উপর "হায় রে পয়সা! হায় রে পয়সা!" করিয়া চলিয়াছে। আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, পৃথিবী নিজেও তাহার কক্ষপথে "হায় রে পয়সা! হায় রে পয়সা!" করিয়া সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে। জ্যোতির্ব্বিদগণ এখনও এ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। কারণ, অর্থের টানই যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মাধ্যাকর্ষণ, তাহা তাঁহাদের এখনও বুঝিতে বাকী আছে। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু প্রমাণ করিয়াছেন ধাতুরও জীবন আছে। তাঁহার গবেষণার দৌড় এই পর্য্যন্ত। আমার গবেষণায় স্থিরসিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, তাম্র, রৌপ্য ও সুবর্ণের কেবল জীবনীশক্তি কেন, তাহাদের এমনি অদ্ভুত শক্তি আছে, যাহার দ্বারা তাহারা বিশ্বচরাচরকে সর্ব্বদা চর্কীপাক খাওয়াইতেছে।

কালমাহাত্ম্যে এবং অদৃষ্টের ফেরে ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্ এখন স্বর্গরাজ্যচ্যুত হইয়া দরিদ্রের কুটিরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। অর্থ এখন তাঁহার সিংহাসন অধিকার করিয়াছে। সে কারণে অধুনা লোকমুখে একমাত্র অর্থের অপার মহিমা গীত হইয়া থাকে। অতএব বুঝিতে হইবে অর্থই এই যুগের পরব্রহ্ম। এই ব্রহ্মবস্তু ব্যতিরেকে বিশ্বসংসারের অস্তিত্ব থাকে না, সকলই নিরর্থক হইয়া যায়। ইনিই চক্রাকার চৈতন্যরূপে ক্যাশ-বাক্সে

অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সংসারকে চালাইয়া থাকেন। এই ব্রহ্মপদার্থই ব্যক্ত ও অব্যক্তরূপে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কারণস্বরূপ। জগতের আধুনিক ইতিহাস শতমুখে ইহারই এহেন মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে। সাধকদিগের হিতার্থে অর্থনীতি শাস্ত্রে ইহার উপাসনা-পদ্ধতি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। জগতের যাবতীয় জীব ও জাতি জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ ও ভক্তিযোগের দ্বারা এই ব্রহ্মবস্তুর সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভের প্রয়াস করে।

এইখানে কিঞ্চিৎ যোগশাস্ত্রের কথা আসিয়া পড়িল। বিদ্যাসাগরী শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, না বলিয়া পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়। কিন্তু, বলিয়া কহিয়া বলপূর্ব্বক পরের দ্রব্য আত্মসাৎ করিলে যে কি করা হয়, তাহা উক্ত শাস্ত্রে লিখিত নাই। আমার মতে ইহাই কর্ম্মযোগের পথ। এই পথের অনুসরণ করিয়া জগতের প্রধান প্রধান শক্তি বা জাতি 'ম্যাক্সিম্' ও 'সীজ-গাণ'এর সাহায্যে পররাজ্যকে স্বরাজ্যে পরিণত করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি ও চরম সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। যে যোগাযোগের দ্বারা পরস্বকে নিজস্বে পরিণত করিতে পারা যায়, তাহাই কর্ম্মযোগ। কর্ম্ম-যোগের মূলে কিঞ্চিৎ জ্ঞানযোগ থাকা আবশ্যক। পরার্থকে স্বার্থ এবং পররাজ্যকে স্বরাজ্য জ্ঞান করিতে হইবে। এই অভেদজ্ঞান হইতেই পরার্থে অধিকার জন্মে, এবং এই জ্ঞানযোগ হইতেই ক্রমে কর্ম্মযোগের সূচনা হয়। ঋজুকুটিলভেদে কর্ম্মযোগের নানাবিধ পথ আছে। কর্ম্মী সাধকগণ নিজ নিজ মেধা ও বুদ্ধিকৌশলে এই সকল পথ আবিষ্কার বা পরিষ্কার করিয়া লয়। কর্ম্মসিদ্ধির উপরেই এই সকল পন্থার উৎকর্ষাপকর্ষ স্থিরীকৃত হয়। কোনও কর্ম্মযোগী নিশাযোগে সিঁদ-কাঠির সাহায্যে পরগৃহে প্রবেশলাভ

করিয়া নির্ব্বিঘ্নে কর্ম্মসিদ্ধি বা কাজ হাঁসিল করিতে সক্ষম হইল। তাহার দেখাদেখি আর একজন সাধক ঐ পন্থার অনুসরণ করিয়া ধৃত হইয়া শ্রীঘরে গমন করিল। একজনের পক্ষে যাহা কর্ম্মযোগ, অপরজনের অদৃষ্টে তাহা বিশুদ্ধ কর্ম্মভোগ। দেশের কর্ম্মক্ষেত্রেও দেখা যায়, একজন স্বদেশী কর্ম্মী সংবাদপত্রের সম্পাদক অথবা বড় উকীল বা ব্যারিষ্টার হইয়া লক্ষপতি ও অনারেবল্ হইলেন, এবং সম্যক্ প্রকারে ঋদ্ধি ও সিদ্ধি লাভ করিয়া তেজারতি আরম্ভ করিয়া দিলেন। কিন্তু তাঁহার পদাঙ্কানুসরণ করিতে গিয়া আর একজন কর্ম্মী বা অকর্ম্মী সিডিশানের চার্জ্জে বন্ধনদশা প্রাপ্ত হইলেন, তাঁহার ছাপাখানা বাজেআপ্ত হইল এবং তাঁহার ভিটায় ঘুঘু চরিল। ইহাকেই বলে—'এক যাত্রায় পৃথক্ ফল'। সুতরাং প্রমাণ হইতেছে, এক পথই সকলের পক্ষে প্রশস্ত নহে।

বঙ্কিমবাবু ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, কোন কোন বুনিয়াদী ঘরের পুণ্যশ্লোক আদিপুরুষ তস্কর ও দস্যুবৃত্তির দ্বারা তাঁহাদের ঘরের বুনিয়াদ পত্তন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের অনেক বংশধর এক্ষণে বহুবিধ খেতাব ও তকমা পাইয়াছেন এবং কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে করমর্দ্দন করিয়া থাকেন। এইরূপ কর্ম্মযোগের দ্বারা যে ঋদ্ধি ও সিদ্ধি লাভ হয়, তাহা সকল দেশেরই ইতিহাস পাঠ করিলে জানা যায়। এই ঐতিহাসিক আদর্শ অনুসরণ করিয়া এদেশের কতকগুলি উন্মার্গগামী অপক্ক যুবক "স্বদেশী ডাকাতি" নামক একপ্রকার নূতন কর্ম্মযোগের আবিষ্কার করিয়াছে। স্বদেশী জুয়াচোরের কথাও সংবাদপত্রে পড়া গিয়াছে। কিন্তু স্বদেশী সিঁদেল চোর ও স্বদেশী পিক্‌পকেটের কথা এ পর্য্যন্ত শুনা যায় নাই। সম্ভবতঃ ইহারা ক্রমশঃ প্রকাশ্য। ইহাদের জন্য আপা-

ততঃ সরকারের খরচে শ্রীঘরে আতিথ্য-সৎকারের বন্দোবস্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহাদের বংশধরগণ প্রাচীন ঐতিহাসিক নজীরানুযায়ী কোন সরকারী খেতাব পাইবে কি না তাহা এখনও স্থির হয় নাই। সম্প্রতি ইহাদের কর্ম্মযোগে যে অনেক নিরীহ লোকের কর্ম্মভোগ বাড়িয়া গিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

অর্থ হচ্ছে চতুর্বর্গের প্রধান বর্গ। বাকী তিন বর্গ ইহারই পিছু পিছু আসিয়া থাকে। অর্থ থাকিলে যথেষ্ট ধর্ম্ম কাম ও মোক্ষ খরিদ করিতে পারা যায়। সুতরাং অর্থরূপ প্রধান বর্গ লাভের জন্যই যতকিছু সাধনার আবশ্যক হয়। অধিকারীভেদে এই সকল সাধনার প্রকারভেদ আছে। এক প্রকার সাধনায় সহস্রবার নিরানব্বইয়ের ধাক্কা খাইতে পারিলে লক্ষপতি হওয়া যায়। আমাদের পাড়ার ফলনা বাঁড়ুয্যে এইরূপ সাধক ছিলেন। ইনি এই অঞ্চলের মধ্যে একমাত্র লক্ষপতি, সুতরাং প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি। ইহার প্রকৃত নামের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ ছিল যে, রসুই ঘরে তাহা উচ্চারিত হইলে ভাতের হাঁড়ি ফাঁসিয়া যাইত। পাছে আমার গবেষণার হাঁড়ি ফাঁসিয়া যায়, এই ভয়ে আমিও এস্থলে তাঁহার নাম করিলাম না।

স্বদেশী হুজুগের সময় পাড়ার যুবকেরা একবার ফলনা বাঁড়ুয্যের বাড়ী চড়াও করেছিল। তাহারা বাঁড়ুয্যে মহাশয়কে বলিল, "এইবার দেশের কাজের জন্য আপনাকে কিছু ব্যয় করতে হবে।" স্বদেশী যুবকদের মুখে এই কথা শুনিয়া বাঁড়ুয্যে মহাশয় কিছু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—

"দেশের কাজে অর্থ ব্যয় করতে হয় না। একাজে চিরদিনই

অর্থাগম হয়ে থাকে। শুনেছি, কল্‌কাতার অনেক বড় বড় লোক বঙ্গভঙ্গের সময় দেশের অনেক কাজ ক'রে বেশ দু'পয়সা গুছিয়ে নিয়েছেন। বাপু হে! তোমরা কী সামান্য দেশের কাজের কথা বলছ? টাকা থাক্‌লে দেশটাকেই কিনে রাখতে পারা যায়। এই বুঝে দেখ, আমি যেসকল জমিজমা খরিদ করেছি, তাহা দেশেরই ছোট ছোট অংশ। খাতকদের বাস্তুভিটা নিলামে সুবিধা দরে ডেকে রেখে বাঁশগাড়ী করে দখল কর্‌তে পার্‌লে সস্তায় দেশেরই কাজ করা হ'ল বুঝ্‌তে হবে। অর্থসঞ্চয় ভিন্ন কোন কাজ হয় না। এই দেখ না কেন, আমি দু'পয়সা সঞ্চয় কর্‌তে পেরেছি ব'লেই তোমরা আজ দেশের কাজের জন্য আমার দ্বারস্থ হয়েছ। অনেক সাহেব সুবাও এই কারণে আমার কাছে এসে থাকেন, এবং চাঁদার খাতা পাঠিয়ে থাকেন। আমাদ্বারা দেশের কাজ হচ্ছে ব'লে আমাকে খেতাব দেবার কথা হচ্ছে।"

যুবকেরা হাঁ করিয়া বাঁড়ুয্যে মহাশয়ের এই সকল সারগর্ভ কথা শুনিতেছিল। তাহাদিগকে বিশেষ মনোযোগী দেখিয়া তিনি বলিলেন—

"আমি প্রাচীন হয়েছি। তোমাদের প্রতি আমার শেষ উপদেশ এই যে, দেশের কাজের জন্য কাহাকেও কখন উপুড়হস্ত হ'তে বল্‌বে না। টাকা বর্‌বাদ করলে দেশের কাজ হয় না। যদি কেহ তোমাদের কাছে কোন দায় জানাতে আসে, তাকে একটি পয়সা না দিয়ে বরং এক সরা চোখের জল দেবে। কারণ, পয়সার অপেক্ষা চোখের জলের মূল্য অধিক।"

ফলনা বাঁড়ুয্যের লেক্‌চারে যুবকেরা কেবল যে আপ্যায়িত

হইয়া বিদায় হইল তাহা নহে, তাহারা স্বদেশসেবার একটি সূক্ষ্মতত্ত্বের সন্ধানলাভ করিল। সেটি হচ্ছে স্বার্থসিদ্ধি।

অনেকে তান্ত্রিকমতে অর্থের সাধনা করিয়া থাকে। ইহারা বীরাচারী বা বামাচারী। এই সাধনায় অনেক চক্র ও চক্রান্ত করিতে হয় এবং পঞ্চ-মকারের আবশ্যক হয়। পশুবলি এই সাধনার একটি প্রধান অনুষ্ঠান। বড়লোকের ঘরের বোকা পাঁঠাকে উৎসর্গ করিয়া থিয়েটারের হাঁড়িকাঠে বলি দিয়া কামিনীর খর্পরে তাহার রুধির ধরিয়া সমাংস করিতে হয়। এই তন্ত্রের সাধনাই আজকাল সহর অঞ্চলে অধিক চলিয়াছে।

নিরামিষ বৈষ্ণবমতেও অর্থের সাধনা হইতে পারে। রসময় আঢ্য এই পথের সাধক। তিনি পরোপকারবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া বিপন্ন ব্যক্তিকে টাকাপ্রতি মাসিক এক আনা সুদে টাকা দিয়া সাহায্য করিতেন। টাকা আদায়ের জন্য খাতককে বিশেষ পীড়া-পীড়ি করিতেন না। খাতক যদি মধ্যে মধ্যে সুদে আসলে একত্র করিয়া হাণ্ডনোট নূতন করিয়া দিত, তিনি তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতেন। তিনি বলিতেন—

"সামান্য টাকার জন্য কাহাকেও উত্যক্ত করা কর্ত্তব্য নয়। তবে যদি তাহার সুদের অংশ আসলের চতুর্গুণ হইয়া কম্বল ভারি হইয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে আদালতের সাহায্যে তখন তাহাকে অঋণী করা কর্ত্তব্য। যেহেতু, অধমর্ণকে চিরদিন ঋণগ্রস্ত করিয়া রাখিলে উত্তমর্ণের পাপ অর্শে।"

সকলে আঢ্য মহাশয়কে একজন পরম বৈষ্ণব মহাজন বলিত। তিনি যুগলরূপের উপাসক ছিলেন। তাঁহার এক দেবতা তুলসীমঞ্চে দারুময় বিগ্রহরূপে বিরাজ করিত; সেখানে তিনি নিত্য গড়াগড়ি

দিতেন। তাঁহার আর এক দেবতা লোহার সিন্দুকের মধ্যে থাকিত। বোধ হয় ইহা তাঁহার ধাতুময় গৌরচন্দ্র; তিনি সর্ব্বদা এই দেবতার ধ্যান করিতেন। আঢ্য মহাশয় একজন বিশেষ জাপক লোক ছিলেন। তিনি জপের মালা ফিরাইতে ফিরাইতে কড়া ক্রান্তি পর্য্যন্ত সুদের হিসাব করিয়া ফেলিতে পারিতেন; সেজন্য কাগজ কলম বা মসীপাত্রের প্রয়োজন হইত না। তিনি বলিতেন—

"বৈষ্ণবধর্ম্ম মিতব্যয়ীর ধর্ম্ম। সেজন্য বৈষ্ণবের দেবতা হচ্চে তুলসী, যাহা সংগ্রহ করিতে অর্থব্যয় হয় না। তাঁহার ভোগ নৈবেদ্য হচ্চে এক পয়সার বাতাসা, যাহা হরিবোল দিয়া ছড়াইয়া দিলেই হইল, পুরোহিতের দক্ষিণা লাগে না। আর তাঁহার বাদ্য-ভাণ্ডের মধ্যে একটি কীর্ত্তনের খোল, যাহার একটি কিনিলে তিন পুরুষের মধ্যে আর ছাওয়াইতে হয় না। অর্থের অপব্যয় করিলেই কি ধর্ম্ম হয়?"

আঢ্য মহাশয় ভক্ত সাধক ছিলেন। কোন খাতক আসিয়া তাঁহার পায়ে ধরিয়া কাঁদিলে তিনিও তাহার সঙ্গে কাঁদিয়া ফেলি-তেন এবং বলিতেন, "আমি আর কিছু করিতে পারিব না, অর্থ আমার নয়; রফা রেয়াত করিতে আমার অধিকার নাই।" ধনাঢ্য আঢ্য মহাশয়ের চোখে জল,—কিছু অপরূপ বটে। যাহার ধন থাকে, তাহার চোখে জল থাকে না। অর্থ বড় গরম জিনিস। ইহার উত্তাপে দেহের সকল রসকস শুখাইয়া যায়; হৃৎপিণ্ড শুষ্ক হইয়া পাষাণ হইয়া দাঁড়ায়; অধরের হাসি রসবর্জ্জিত হইয়া কাষ্ঠ-হাসিতে পরিণত হয়; ললাটের চর্ম্ম শুখাইয়া তাহাতে বিরক্তির রেখা উৎপাদন করে; সর্ব্বদাই ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া থাকে; মন

অত্যন্ত গরম হইয়া দেহকে দগ্ধ করিতে থাকে; সে কারণে মুখ দিয়া যে সকল বাক্য বাহির হয়, তাহাতেও বিলক্ষণ উত্তাপ থাকে। কেবল সিল্‌ভার টনিকের জোরেই প্রাণধারণ করা সম্ভব হয়। কেহ বলিবেন, তবে আঢ্য মহাশয়ের চোখে জল আসিত কোথা হইতে? এ কথার উত্তর আঢ্য মহাশয় নিজেই দিয়াছেন,—অর্থ তাঁহার নয়। তিনি যক্ষের বিশ্বস্ত কেশিয়ার বা তহবিলদার মাত্র। প্রভুর অর্থ তিনি স্পর্শ করিতেন না; সুতরাং সে অর্থের উত্তাপও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিত না। অর্থ যে তাঁহার নয়, একথা অবশ্য বিশ্বাসযোগ্য। যেহেতু অনেকেই জানিত যে, আবশ্যক হইলে আঢ্য মহাশয় লোহার সিন্দুকের নিকট হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া টাকা কৰ্জ্জ লইতেন, এবং যথাকালে সুদে আসলে হিসাব করিয়া তাহা পরিশোধ করিতেন।

মনুষ্য-সমাজে এরূপ কোন কোন লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা তহবিল-তস্‌রুপে সতত সিদ্ধহস্ত। খোদার নিকট হইতে তাঁহাদের নিকট যত মনি-অর্ডার আসিতে থাকে, তাঁহারা তাহা সমস্তই খরচ করিয়া বসেন। এই সকল লোকের খরচের হিসাবের অন্ত নাই। অমুক ব্যক্তির কন্যাদায়, দাও তাহাকে এত টাকা; অমুক লোকের ভিটামাটি বিক্রি হইয়া যাইতেছে, দাও তাহাকে এত টাকা; অমুক জায়গায় দুর্ভিক্ষ হয়েছে, পাঠাও সেখানে এত টাকা; অমুক অনাথ আশ্রমে সাহায্য চাহিয়াছে, দাও সেখানে এত টাকা; এত টাকা না হ'লে দেশের এই কাজটা হয় না, দাও তাহাতে এত টাকা। এইরূপে এই সকল অমিতব্যয়ীদিগের যত আয়, তত ব্যয়, শূন্য স্থিতি। অর্থ যেন ইঁহাদিগের বদ্‌রক্ত, তাহা কোনও গতিকে দেশের ও দশের কাজে বাহির হইয়া গেলেই ইঁহাদের

সুনিদ্রা হয়। ইহারা একবার ভাবেন না যে, খোদা যখন নিজের কোর্টে পাইয়া তাঁহাদের বিরুদ্ধে এম্‌বেজল্‌মেণ্টের চার্জ্জ আনিবেন, তখন বাচাধনেরা কি জবাব দিবেন।

এই সকল ব্যক্তি যে কেবল ঈশ্বরের নিকট অবিশ্বাসী তাহা নহে, ইঁহাদের মত অল্পবুদ্ধি লোক ছুনিয়ায় নাই। নির্ব্বোধ না হইলে কে কোথায় নিজের কাজ হারাইয়া পরের কাজে সর্ব্বস্বান্ত হয়? এই শ্রেণীর মনুষ্য এত নির্ব্বোধ কেন?—এই প্রশ্ন লইয়া আমি অনেক গবেষণা করিয়া বুঝিয়াছি যে, বোধোদয়ের পুত্তলিকার মত ইঁহারা চক্ষু থাকিতেও দেখিতে পান না, কর্ণ থাকিতেও শুনিতে পান না। ভগবান্ ইঁহাদের পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়কে ক্রিয়াহীন করিয়া, ইঁহাদের বুকের মধ্যে কার্য্যক্ষম কেবল একটি-মাত্র ইন্দ্রিয় দিয়াছেন,—সেটি হচ্ছে হৃদ্‌পিণ্ড। তাঁহাদের দর্শনশ্রবণাদি সমস্ত কার্য্যই কেবলমাত্র এই ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়াই হইয়া থাকে। তোমার-আমার মত পঞ্চেন্দ্রিয়বিশিষ্ট জীব অপেক্ষা এরূপ একেন্দ্রিয়বিশিষ্ট জীব যে অল্পবুদ্ধি হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

অর্থের কদর বুঝে না, এরূপ আর এক শ্রেণীর লোক আছে। অর্থের সঙ্গে ইহাদের চিরবিরোধ, পরস্পরে মুখ দেখাদেখি পর্য্যন্ত হয় না। ইহারা বলে যে, উদরে অন্ন প্রবেশ করিলেই নিদ্রাকর্ষণ হয়—খালিপেটে কখনও ঘুম পায় না; সুতরাং যখন অন্নচিন্তা চমৎকার হইয়া উঠে, তখন মানুষের বুদ্ধি সহস্র দিকে খেলাইতে থাকে, কর্ম্মচেষ্টা শতমুখী হইয়া শতদিকে ধাবিত হয়, দীন দরিদ্রের প্রতি সমবেদনা জীবন্ত ভাবে জাগিয়া উঠে, এবং ভগবান নামে যে ভ্যাগাবণ্ড্ আছে তাহার সহিত

বন্ধুত্ব হয়। অতএব ইহাদের মতে দেশের লোকের যত অন্নকষ্ট বাড়িতে থাকিবে, ততই তাহাদের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল। আমি এই সকল কাণ্ডজ্ঞানশূন্য লোককে বাতুলাশ্রমে আটক করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা দিতেছি। ইহারা ছাড়া থাকিলে হুজুগে মাতিয়া গণ্ডগোল বাধাইতে পারে। এই দলের বার জন লোক উনিশ শত বৎসর পূর্ব্বে জেরুসালেমে যীশুখৃষ্টের দলে ভিড়িয়া হুজুগে মাতিয়া এক বিশ্বব্যাপী গোলযোগ বাধাইয়া গিয়াছে। এই সকল লক্ষ্মীছাড়া লোক ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ফরাসী দেশকে ওলট্-পালট্ করিয়াছিল।

এই শ্রেণীর অকিঞ্চনদিগের দ্বারা দেশের কোনই ভাল কাজ হইবে না। যতকিছু ভাল কাজ আছে, তাহা ধনবানেরাই চারি-যুগ ধরিয়া করিয়া আসিতেছে। ধনিগণ দেশের, অর্থাৎ নিজেদের, ধনাগমের জন্য কল-কারখানা স্থাপন করিবে, আর দরিদ্র সেখানে কুলী হইয়া মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া দিন-মজুরি করিবে। ধনী নিজ অর্থব্যয়ে হাঁসপাতাল করিয়া দিবে, দরিদ্র অন্নাভাবে রুগ্ন হইয়া চিকিৎসার জন্য সেখানে আশ্রয় লইবে। ধনী অন্নসত্র খুলিয়া দিবে, আর দীন ভিখারী সেখানে নিত্য পাত পাড়িবে। আমি দেখিতেছি, ধনবানেরাই দরিদ্রদিগের বাহন—এক শ্রেণী অপর শ্রেণীর স্কন্ধে বিচরণ করে। দরিদ্রগণ কিন্তু এজন্য ধনীদিগের নিকট ঋণ স্বীকার করিতে চাহে না। তাহারা বলে, "আমা-দের মুখের অন্ন কাড়িয়া লইয়া ধনিগণ ধনসঞ্চয় করিয়াছে; অতএব তাহাদের কাঁধে চড়িবার আমাদের অধিকার আছে।" আমি ধনীদিগকে উপদেশ দিতেছি যে, দরিদ্রগণ বড়ই অকৃতজ্ঞ; সুতরাং তাহারা দ্বারে আসিলে কুকুর লেলাইয়া দিবে।

উপরোক্ত দুই শ্রেণীর লোক মা লক্ষ্মীকে আটক করিতে জানে না। শুনিয়াছিলাম, আমাদের পাড়ার আঢ্য মহাশয়ের বাড়ীতে লক্ষ্মীপূজায় বস্ত্র ব্যতিরেকে আর সকল জিনিস দেওয়া হইত। উদ্দেশ্য এই, মা লক্ষ্মী পূজা খাইয়া চলিয়া যাইতে পারিবেন না; তাঁহাকে বস্ত্রবিহনে লজ্জায় বাধ্য হইয়া বাড়ীর মধ্যেই লুকাইয়া থাকিতে হইবে। চঞ্চলাকে বাঁধিয়া রাখিতে হইলে ধর্ম্মকর্ম্মের ভিতরেও অনেক বুদ্ধি ও অনেক কৌশলের আবশ্যক হয়। নির্ব্বোধ লোকগণ পরোপকারে অর্থব্যয় করিয়া মনে করেন, খুব ধর্ম্ম করিলেন। তাঁহারা জ্ঞাত নহেন যে, বিধবা-বিবাহের ন্যায় পরোপকারধর্ম্মও কলিতে নিষিদ্ধ। সাধারণের হিতার্থে গোপনে টাকা খরচ করা, আর আঁধারে ঘুষ দেওয়া, একই কথা। যদি চক্ষুলজ্জার খাতিরে এ কুকর্ম্মে কখনও কিছু অপব্যয় করিতে হয়, তাহা হইলে সংবাদপত্রে ঢাক বাজাইয়া করিতে হইবে। কেহ কেহ গোপনে দেশের ও দশের কাজে অর্থব্যয় করেন বটে। তাঁহারা বলেন, কুকর্ম্ম গোপনে করাই ভাল।

এই সকল কাজে অর্থব্যয় করা কুকর্ম্ম কি সুকর্ম্ম, তাহা অনেকে ঠিক করিয়া উঠিতে পারেন না। দেশের ও দশের কোন্ কাজ বৈধ, আর কোন্ কাজ অবৈধ, তাহা আজকাল ঠিক করা দুরূহ। এজন্য আমি ধনাঢ্যদিগকে দানধর্ম্ম বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষ-দিগের পরামর্শ লইতে অনুরোধ করি। দ্বাপরযুগের দাতা-কর্ণ অতিথিসৎকারের জন্য পুত্রহত্যা করিয়া নাম কিনিয়া গিয়াছেন। আজকাল কেহ ঐরূপ করিলে তাহাকে মাফিক আইন আমলে আসিতে হইবে। সুতরাং এ যুগের দাতাকর্ণ-

দিগের নাম কিনিবার আবশ্যক হইলে বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক আইন ধরিয়া কার্য্য করিতে হইবে। রাজপুরুষদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া এ কার্য্য করিলে তাঁহাদিগের ক্ষতি হইবে না। দেশভক্তির সহিত রাজভক্তির যোগ থাকা আবশ্যক। ইহাই ভক্তিযোগের প্রশস্ত পথ। এ পথে অর্থব্যয় করিলে তাহা নিরর্থক হইবার সম্ভাবনা নাই। ভক্তিযোগের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকিলেই কর্ম্মযোগ সার্থক হয়। কর্ম্মযোগ নিম্নস্তরের সাধনা। ভক্তিযোগ উচ্চস্তরের সাধনা। কর্ম্মমার্গ সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিলে সাধনাকে ভক্তিযোগের পথে পরিচালিত করিতে হয়; নচেৎ সিদ্ধিলাভ ঘটে না।

একটি সামান্য উদাহরণ দিয়া এই জটিল যোগরহস্য বুঝাইয়া দিব। একদিন এক ছিঁচ্‌কে চোর মধুসূদন দত্তের বাড়ী জনশূন্য দেখিয়া তন্মধ্যে অনধিকার প্রবেশ করিয়া কৃত্রিম চাবিকাঠির সাহায্যে একটি ঘরের তালা খুলিতেছিল। এমন সময় মধুসূদন আসিয়া চোর বাবাজীকে পাকড়াও করিয়া বেদম প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। চোরের চীৎকারে পাড়ার লোক ভাঙ্গিয়া আসিল। দত্তজার নির্ম্মম প্রহারে চোর পাছে মারা পড়ে, এই ভয় করিয়া একটি স্ত্রীলোক বলিয়া উঠিল, "আহা! ওকে আর মেরো না গো, আর মেরো না,—আর মার্‌লে ও যে মরে যাবে; এইবার বরং ওকে পুলিসে দাও।" এই কথায় দত্তজা প্রহার স্থগিত করিল। তাহাতে চোর বেচারী প্রমাদ গণিল—বুঝি বা তাহাকে এইবার পুলিসে দেওয়া হয়। সে বলিয়া উঠিল, "না না, উনি আমাকে আরও মারুন; উনি আমাকে জ্ঞান দিচ্ছেন, উনি মেরে আমার বাপের কাজ কচ্ছেন; ওঁর মারে

আমার চৈতন্য হচ্ছে, যেন আর এমন কুকর্ম্ম না করি।" ভূতের মুখে রামনাম শুনিয়া সকলে হাসিয়া উঠিল। তাহাকে আর পুলিসে চালান দেওয়া হইল না।

এ গল্পের তাৎপর্য্য এই যে, তস্কর একজন কর্ম্মীবিশেষ। সে দত্তজার গৃহে দ্বারোদ্ঘাটনরূপ কর্ম্মযোগে ব্রতী হইয়াছিল। যখন কার্য্যগতিকে এই কর্ম্মযোগে বদ্ধ হইয়া আসিল, তখন সে ভক্তি-যোগের সাধনা করিয়া মুক্তিলাভ করিল। তাহার প্রহার-ভয় ও পুলিসের ভয় যুগপৎ ঘুচিয়া গেল। যোগের দ্বারা যাহারা সিদ্ধিলাভ করে, তাহাদের কোন ভয় থাকে না। সকল কর্ম্মযোগের ক্ষেত্রেই যেন তেন প্রকারেণ সিদ্ধিলাভ করা চাই।

আর একটি উদাহরণ হইতে কর্ম্মযোগ ও ভক্তিযোগের সম্বন্ধ আরও বিশদ হইবে। দুই ব্যক্তি পরস্পরে মারামারি করিতেছে। শাস্ত্রীয় ভাষায় ইহারা উভয়ে ঘুসাঘুসিরূপ কর্ম্মযোগের সাধনা করিতেছে। যে ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত অধিক দৈহিক বলশালী, সে বেশী diplomatic হয় না। দুর্ব্বলকেই অনেক রকম চাল চালিতে হয়। এই দুই ব্যক্তির মধ্যে যে বেশী diplomatic, সে অবশ্যই এক হাত তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীর গলায় রাখিয়া, আর এক হাত তাহার পায়ের দিকে রাখিবে। কারণ, সে জানে, যদি কর্ম্মযোগে না কুলায়, তাহা হইলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ ভক্তিযোগের আশ্রয় লইতে হইবে। ভক্তির প্রথম কাজ হচ্ছে পায়ে ধরা। তাই সে পূর্ব্ব হইতে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীর পায়ের দিকে এক হাত রাখিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়।

আজ এই যে ইউরোপের জাতিসকল দুই দলে বিভক্ত হইয়া বিশ্বব্যাপী নরমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন, ইহাও কর্ম্মযোগের

একটি বিরাট ব্যাপার। ইহা তাঁহাদিগের বহুদিনের সঞ্চিত পুণ্যের ফল। ইংরাজ, ফরাসী, জার্ম্মাণ ও রুশ প্রভৃতি ঋত্বিক্‌গণ সকলেই স্বদেশপ্রেমের হবিঃ দ্বারা এই যজ্ঞাগ্নির উদর পূরণ করিতেছেন। তাঁহারা প্রত্যেকেই বলিতেছেন যে, "স্বদেশের ও স্বজাতির মঙ্গলের জন্য" সঙ্কল্প করিয়া এই নরমেধ যজ্ঞে ব্রতী হইয়াছেন, পূর্ণাহুতি না দিয়া কেহই নিরস্ত হইবেন না। পাশ্চাত্য জগতের স্বদেশপ্রেম নামক অদ্ভুত পদার্থকে বিশ্লেষণ করিলে তাহা গোলাগুলি, ম্যাক্সিম্, কামান, বোমা ও বেয়নেটে পরিণত হয়। জার্ম্মাণীর এই বিকৃত স্বদেশপ্রেম হইতেই আজ এই আন্তর্জাতিক অশান্তির উৎপত্তি হইয়াছে। যেখানে শান্তিরক্ষক পুলিস প্রবল প্রতাপান্বিত, সেখানে শান্তি ভঙ্গ হয় না। পুলিসের বেটনের মধ্যে গুলি-বারুদ না থাকিলেও, তাহা magic wand বা ভোজবাজীকরের যষ্টির মত ভৌতিক শক্তিসম্পন্ন। ইহার প্রভাবে উন্মার্গগামী উদ্দাম স্বদেশপ্রেম সংযত হইয়া ক্রমে বিশ্বমানবপ্রেমে পরিণত হয়। কোনদিন যদি সমগ্র ইউরোপ এক সর্ব্বশক্তিমান পুলিসের অধীন হয়, তাহা হইলেই সেখানে সকল অশান্তির নিরাকরণ হওয়া সম্ভব। কিন্তু স্বাধীন দেশের উপর ভগবানের শাপ এই যে, সেখানকার পুলিস সর্ব্বশক্তিমান হয় না। সুতরাং ইউরোপের মাটিতে সত্বর শান্তি ও বিশ্বমানব-প্রেমের বীজ অঙ্কুরিত হইবার আশা নাই।

পূর্ব্বকালে রাজায় রাজায় যুদ্ধ হইত। এখন প্রজায় প্রজায় যুদ্ধ হয়, রাজা নিমিত্তমাত্র। ইউরোপের প্রজাপুঞ্জ সম্প্রতি এই যে কর্ম্মযোগের গোলযোগ বাধাইয়াছে, তাহাও সত্বর বা বিলম্বে নিশ্চয়ই ভক্তিযোগে পরিণত হইবে। যথাসময়ে যে

পক্ষের কর্ম্মক্ষয় হইবে, তাহাকে তৎক্ষণাৎ অপর পক্ষের পায়ে ভক্তিভরে গড়াইয়া পড়িতে হইবে। অনেকে বলিতেছেন, জার্ম্মাণীকেই অগ্রে গড়াইতে হইবে। যখন তাহা ঘটিবে, তখন বুঝিতে হইবে যে, জার্ম্মাণ জাতি নিম্নস্তরের কর্ম্মমার্গ ছাড়াইয়া উচ্চস্তরের ভক্তিমার্গে পৌঁছিল।

ভারতবাসী বহুদিন হইতে কর্ম্মমার্গ ছাড়াইয়া ভক্তিমার্গে উঠিয়াছে। তাহারা এখন উচ্চ অঙ্গের সাধক। এ দেশের সামান্য কেরাণী হইতে আরম্ভ করিয়া রাজা মহারাজা পর্য্যন্ত সকলেই ভক্তিমার্গের পথিক। কেহবা ধড়াচূড়া পরিয়া উপাস্য বিগ্রহের মন্দিরে নিত্য গমন করিয়া ষাষ্টাঙ্গে সেবা দিয়া আসেন, কেহবা ইংরাজি বাঙ্গালা সংস্কৃতে নানাবিধ গাল-বাদ্য করিয়া ইষ্ট দেবতাকে প্রসন্ন করিয়া থাকেন। কিন্তু সকলেই "ধনং দেহি ধনং দেহি" রবে তাঁহার কর্ণ বধির করেন। কারণ, ধনই সকল সাধনার চরম সিদ্ধি।

অর্থ সকলেরই কাম্যবস্তু। কিন্তু অর্থ যে কি, তাহা কেহই বুঝেন না। আমি দৈব গবেষণার দ্বারা অদ্বৈতবাদের সাহায্যে অর্থের প্রকৃত স্বরূপ অবগত হইয়াছি। চরাচর বিশ্বসংসারে এক বস্তু যদি কিছু থাকে, তাহা অর্থ; অর্থ ভিন্ন আর কিছুরই অস্তিত্ব নাই। তুমি বলিবে, তুমি কৃতী—তোমার কৃতিত্ব আছে। কৈ, তোমার ক্যাশ বাক্স খুলিয়া দেখাও। যদি তাহার মধ্যে অর্থ থাকে, তবেই বুঝিব তোমার কৃতিত্ব আছে; নচেৎ তোমার তুল্য অকৃতী আর জগতে নাই। যদি তুমি স্ত্রীর ভালবাসার বড়াই কর, তাহা হইলে আমি তাহার গহনার বাক্স খুলিয়া দেখিতে চাহি যে, তাহার মধ্যে তোমার অর্থ রূপান্তরে স্বর্ণরূপে বিরাজ

করিতেছে কি না। যদি তাহা না করে, তাহা হইলে বুঝিব, তোমার স্ত্রীর ভালবাসারও অস্তিত্ব নাই। তুমি বলিবে তোমার বুদ্ধি আছে। তোমার শূন্য তহবিল বিশ্ববাসীর চক্ষে তোমাকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করিবে। জাতি কুল মানের ন্যায় বুদ্ধিও এখন লোহার সিন্দুকে থাকে—মস্তিষ্কে থাকে না। তোমার অর্থ থাকিলেই তোমার মনুষ্যত্ব থাকা সম্ভব। দরিদ্রের মনুষ্যত্ব থাকিতে পারে, এ কথা দুনিয়ার লোক বিশ্বাস করে না। যাহার 'কড়ার মুরদ' নাই, কে তাহাকে মানুষ বলিয়া গণ্য করিবে? রূপের কথা বলিবে? সে ত বিশুদ্ধ অর্থ! বড়লোকের কাণা পুতও পদ্মলোচন। শরীরের শক্তি? সে ত অর্থেরই রূপান্তর। অর্থাভাবে সকলকেই চিঁ চিঁ করিতে হয়। যদি বল, তোমার ভদ্রতা আছে—তুমি একজন ভদ্রলোক। আমি তোমার পকেট একজামিন্ করিয়া বলিয়া দিব, তোমার কথা ঠিক কি না। অর্থ থাকিলেই ভদ্রলোক, সুতরাং অর্থ না থাকিলেই ছোটলোক —এখন এই মতই সভ্যজগতে সর্ব্ববাদীসম্মত। 'অলমতি-বিস্তরেণ'। অতএব প্রমাণ হইল যে, অর্থ ভিন্ন আর কিছুরই অস্তিত্ব নাই। অল্পবুদ্ধি দ্বৈতবাদী হয় ত বলিবে, অর্থ ও ভগবান্ উভয়ই আছেন। আমি অদ্বৈতবাদ লইয়া দুনিয়ায় আসিয়াছি, সুতরাং আমি দু'য়ের অস্তিত্ব স্বীকার করিব না। আমি বলিব, অর্থই আছে—ভগবান্ নাই। ইহা আমার একার মত নহে। জগতের যত সমৃদ্ধিশালী বড়লোক আমার এই মতেরই কার্য্যতঃ পোষকতা করেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

—++:*:++—

বিদ্যা ও বুদ্ধি

ভাব গোপন করিবার জন্য ঈশ্বর মানুষকে ভাষা দিয়াছেন। আর, মা সরস্বতী বিদ্যা দিয়া থাকেন সত্যের অপলাপের জন্য। যাঁহার পেটে অধিক বিদ্যা, তিনি হয়কে নয় করিতে পারেন, এবং নয়কে হয় করিতে পারেন। সংবাদপত্রের সম্পাদকগণই এ কথার প্রমাণ। ইঁদুরের মত সত্যও আজকাল ছাপাখানার কলে পড়িয়া চালভাজা খাইতেছে। বাল্যকালে মনে করিতাম, ছাপার অক্ষরে যাহা প্রকাশিত হয়, তাহা মিথ্যা হইতে পারে না; সুতরাং সংবাদপত্রের কথায় অবিশ্বাস করিবার সাধ্য ছিল না। এখন বুঝিয়াছি, সংবাদপত্রগুলি উল্টা করিয়া পড়িলেই সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

জন্মান্তর-রহস্যজ্ঞ এক সাধু আমাকে বলিয়াছিলেন, পূর্ব্ব-জন্মে একদল লোক উদরান্নের জন্য ক্রমাগত বর প্রার্থনা করিয়া বিধাতাপুরুষকে উত্ত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন—"তোমরা মর্ত্ত্যে গিয়া সংবাদপত্রের সম্পাদক হও। তোমরা যাহাকিছু লিখিবে, তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা হইলেও, তাহা বেচিয়াই তোমাদের পেট চলিয়া যাইবে। তোমাদের বিদ্যার অভাব হইলেও বুদ্ধির অভাব হইবে না।"

পেটের দায় বড় দায়। উদর ও অন্যান্য অবয়বের গল্পে তাহা

প্রমাণিত হইয়াছে। কেবল হস্তপদাদিই যে উদরের জন্য দিবানিশি পরিশ্রম করে, তাহা নহে। সাহিত্যিকের লেখনীও সকল রকমে এই উদরেরই দাসত্ব করিয়া থাকে। ঐতিহাসিক ইতিহাস লেখেন উদরের জন্য। সুতরাং তাহা স্কুলপাঠ্য হওয়া চাই এবং তাহার। মধ্যে তদুপযুক্ত কথার সন্নিবেশ করা চাই, নচেৎ সকল শ্রম পণ্ড হইয়া যাইবে। আমাদের গ্রামের স্কুলের হেড্ পণ্ডিত মহাশয় সময়োচিত চিত্রযুক্ত একখানি পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করিয়া শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষদিগের নিকট কিছুদিন দরবার করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তিনি বলিতেন—"স্কুলের ছেলেরা আজকাল যেরূপ নীতিভ্রষ্ট ও অশান্ত হইতেছে, তাহাতে পাঠ্যপুস্তকের ভিতর দিয়া তাহাদিগকে একটু রাজভক্তি শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক হইয়াছে। তাঁহার কথা নিশ্চয়ই সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত; যেহেতু বিষ্ণু-শর্ম্মা বলিয়াছেন, 'যন্নবে ভাজনে লগ্নঃ সংস্কারোনান্যথা ভবেৎ,' অর্থাৎ কাঁচা হাঁড়ির গায়ে দাগ কাটিয়া দিলে, সে দাগ হাঁড়ি পোড়াইবার পরেও তাহার গায়ে চিরদিন থাকিয়া যায়।"

একদিন এক সংবাদপত্রের সম্পাদক পণ্ডিত মহাশয়কে বলিলেন —"আপনারা পাঠ্যপুস্তকের ভিতর দিয়া ছাত্রদিগকে রাজভক্তির সঙ্গে একটু আধটু সরল রাজনীতি শিক্ষা দেন না কেন? আমাদের সভ্য রাজপুরুষেরা বিদেশী লোক হইলেও, তাঁহারা ভারতবর্ষে আসিয়া এদেশের প্রজাগণের কত কল্যাণ সাধন করিতেছেন, তাহা আপনাদের পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে উল্লেখ করা আবশ্যক। তাঁহাদের উদ্যোগে এদেশের কত স্থানে কতশত স্কুল কলেজ স্থাপিত হইয়াছে এবং তাহাতে দেশের সকল শ্রেণীর মধ্যে কিরূপ শিক্ষা ও জ্ঞানবিস্তার হচ্ছে; তাঁহাদের চেষ্টায় চারিদিকে রেলওয়ে, টেলি-

গ্রাফ, ডাকঘর ও হাঁসপাতাল হওয়ায় সাধারণের কি পর্য্যন্ত সুবিধা হয়েছে; তাঁহাদের সুশাসনে দেশের সর্ব্বত্র শান্তি সংস্থাপিত হওয়ায় কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের কতদূর উন্নতি হচ্ছে এবং তাহাতে দেশবাসীর কিরূপ সুখ, সম্পদ ও স্বাস্থ্যবিধান হচ্ছে; এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশের লোকের কাছ থেকে ভারতবর্ষের লোক কত উপকার পাচ্ছে,—এই সকল কথা আমাদের ছাত্রদের শিক্ষা দিলে তাহাদের প্রাণে রাজপুরুষদিগের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধার সঞ্চার হবে, আর সেখানে anti-foreign feeling বা বিদেশী-বিদ্বেষের বীজ অঙ্কুরিত হোতে পারবে না।"

এই কথা শুনিয়া পণ্ডিত মহাশয় ভীত হইয়া বলিলেন, "আরে বাপ্ রে! এসকল যে পলিটিক্স! স্কুলের ছেলেদের জন্য পলিটিক্স নয়। তাহাদের মধ্যে পলিটিক্স ঢুকিলে আর তাহাদের রাজভক্তি ঠিক থাকিবে না।" কাহারও কাহারও মতে এই কথাই ঠিক। সে যাহা হউক, পণ্ডিত মহাশয়ের কথা শুনিয়া আমার সেই কৃপণের আলুর খোসার উৎকৃষ্ট তরকারি রন্ধনের কথা মনে পড়িয়া গেল। এই তরকারি রাঁধিতে হইবে কেবল জলের ঝাপ্টা দিয়া—তাহা হইলেই একেবারে নেওয়া; আর তেল ঝাল মসলা দিয়েছ কি একদম মাটি!

ইদানীং এদেশের সর্ব্বত্রই সাহিত্যের রন্ধনশালায় বিশুদ্ধ জলের ঝাপ্টা দিয়াই যতকিছু তরকারি রন্ধন করা হইতেছে। দেশী সংবাদপত্রের ভিতরে ত তেল ঝাল মসলার নামগন্ধ থাকে না। রয়টার প্রভৃতি পাচকেরা বিদেশ হইতে আমাদের রসনার উপযোগী যে সকল অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া পাঠান, তাহাতে যেন লুণ-ঝালের অভাব বলিয়া মনে হয়। রন্ধনের দোষ, কি আমাদের

মুখের দোষ, বলিতে পারি না! মাসিক পত্রগুলির স্তম্ভে ত কেবল পচা প্রত্নতত্ত্বের তরকারি থরে থরে সাজাইয়া দেওয়া হয়, এবং তাহা হইতে অনেক সময় দুর্গন্ধ বাহির হইতে থাকে। কিন্তু পাঠকগণ তাহাই উদরস্থ করিয়া লেখকের হাতের তারিফ করেন, আর লেখক তাহাতে ফুলিয়া ওঠেন। Foreign অর্থাৎ বিদেশাগত পত্রিকাগুলিতে যে সকল প্রবন্ধ থাকে, তাহাতে পিঁয়াজ রশুনের উগ্রগন্ধ ভরভর করে। সুতরাং তাহা এদেশের লোকের পেটে বরদাস্ত হয় না, খাইলেই পেট ফাঁপিয়া ওঠে।

সাহিত্যের হাঁড়িতে কাঠি দিয়া হাত পাকাইবার ইচ্ছা আমার বালককাল হইতেই ছিল। একার্য্যে যে বিদ্যাবুদ্ধির আবশ্যক হয়, তাহা যে আমার ছিল না, তাহা বলিতে পারি না। কারণ, ঠাকুরদাদা আমাকে "বুদ্ধির ঢেঁকি" বলিতেন। আর তাঁহারই মুখে শুনিয়াছিলাম, আমার বিদ্যাও নাকি টন্‌টনে চার পোয়া ছিল। সুতরাং আমি সাহসে ভর করিয়া প্রথমে সংবাদপত্রের সংবাদদাতারূপে কলমবাজী আরম্ভ করিয়া দিলাম। কলিকাতার একজন সম্পাদকের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়া তাঁহার দৈনিক পত্রে আমাদের গ্রাম ও আশপাশের সকল খবর ধারাবাহিকরূপে লিখিয়া পাঠাইতে আরম্ভ করিলাম। আমি উক্ত পত্রের "বিশেষ সংবাদদাতা" বলিয়া সর্ব্বত্র আপনার পরিচয় দিতে আরম্ভ করিলাম। একবার গ্রামের দলাদলীর কথা লইয়া আমাদের বিপক্ষদলের লোকদিগকে মনের সাধ মিটাইয়া কলমের খোঁচা মারিয়া একখানি সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়া সংবাদপত্রে পাঠাইলাম। সম্পাদক মহাশয় তাহা মুদ্রিত করিলেন না। আমি কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি প্রত্যুত্তরে লিখিলেন—

"আপনার পত্রখানি মানহানিকর হইয়াছে। তাহা প্রকাশ করিলে আমাদিগকে আদালতে দণ্ডনীয় হইতে হইবে। আর, আপনাদের গ্রামের দলাদলীর কথা শুনিবার জন্য দেশের লোক উৎগ্রীব হইয়া আছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। আপনি দলাদলীর কথা না লিখিয়া, বরং গ্রামের স্বাস্থ্য, জলবৃষ্টি ও শস্যের অবস্থার কথা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া লিখিয়া পাঠাইবেন। অন্য সংবাদাভাবে পত্রের কলেবর পূরণের জন্য তাহা আমরা অকাতরে মুদ্রিত করিব। আর, আপনার এবারে পত্রখানি অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়াছিল, তাহাকে পত্র না বলিয়া 'পুস্তক' বলিলেও চলে। সুতরাং আপনি ইচ্ছা করিলে তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে পারেন, অথবা কোনও মাসিক পত্রে দফায় দফায় প্রকাশের জন্য পাঠাইতে পারেন।"

সম্পাদক মহাশয়ের এই পত্র পাঠ করিয়া আমার সাহস বাড়িয়া গেল। তবে ত আমি একজন মাসিক পত্রের লেখক বা গ্রন্থকার হইয়া দাঁড়াইয়াছি। সুতরাং এখন হইতে তুচ্ছ সংবাদপত্র ছাড়িয়া দিয়া আমি মাসিক পত্রিকার স্তম্ভে লেখনী সঞ্চালন করিতে আরম্ভ করিলাম। আমার লেখা পাইবার জন্য ক্রমে অনেক সম্পাদক আমার নিকট আসিতে লাগিলেন। আমার লেখার একটু বিশেষত্বের জন্যই তাহার এত আদর বাড়িয়া গিয়াছিল। কোন বড় বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিয়া তাহার মধ্যে আমি নিজের কথাই পাঁচ কাহন করিতাম। আমি জানিতাম যে, আজকাল সাহিত্যজগতে নাম কিনিতে হইলে, প্রবন্ধের মধ্যে লেখককে তাহার স্বকীয় উত্তমপুরুষের কিঞ্চিৎ অধিক ওড়নপাড়ন করিতে হয়। ইহা উচ্চশ্রেণীর লেখকের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ।

একবার কোন প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রে "ভারতে আর্য্যজাতির অভ্যুত্থান" নামে একটি প্রবন্ধ পাঠাইয়াছিলাম। এই প্রবন্ধের ভণিতা করিতে গিয়া আমাকে নিজ জীবনের ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ঘটনা সম্বন্ধে কিছু লিখিতে হইয়াছিল। কারণ, পাঠকেরা লেখকের নিজের কথা শুনিবার জন্যই সর্ব্বদা উৎকণ্ঠ হইয়া থাকে। সুতরাং তাহাদের উৎকণ্ঠা নিবারণের জন্য আমাকে লিখিতে হইল যে, আর্য্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া আমি কিরূপে শৈশবে মাতৃক্রোড়ে ও ধাত্রীক্রোড়ে লালিত-পালিত হইয়াছিলাম; বাল্যকালে কিরূপে পাঠশালে গুরুমহাশয়ের জন্য নিত্য এক ছিলিম তামাকু সরবরাহ করিয়া লেখাপড়া শিখিয়াছিলাম; বর্ত্তমানে সাবালক হইয়া আমাকে কিরূপ দেশহিতের জন্য মাসিক পত্রের স্তম্ভে লেখনী ধারণ করিতে হইয়াছে; এবং ভবিষ্যতে যখন আমার বিবাহ হইবে, তখন আমাকে শ্বশুরবাড়ী গিয়া কিরূপে শালী-শালাজদিগকে নিজের বাহাদুরীর গল্প শুনাইয়া রাত কাটাইয়া দিতে হইবে। ভণিতায় এইরূপ আত্মকথা বলিতেই প্রবন্ধের কলেবর পূর্ণ হইয়া গেল। সুতরাং 'ক্রমশঃ' দিয়া ইতি করিয়া তাহা সম্পাদকের নিকট পাঠাইয়া দিলাম।

কয়েকদিন পরে সম্পাদক মহাশয় প্রবন্ধটি আমাকে ফিরাইয়া দিয়া লিখিলেন—"আপনি শ্বশুরমন্দিরে গিয়া যখন আত্মকাহিনীর একাধিক সহস্র রজনীর আখ্যায়িকা বলিতে আরম্ভ করিবেন, তখন আশা করি আপনার কোনও চতুর শ্যালক আপনার পেট চুলকাইয়া দিবে; নচেৎ বাড়ীতে কেহই রাত্রে নিদ্রা যাইতে পারিবে না। শুনিয়াছি, পাঁঠা কোন নূতন স্থানে নীত হইলে সমস্ত রাত্র ভ্যা ভ্যা করিয়া চীৎকার করে এবং বাড়ীর কাহাকেও ঘুমাইতে

দেয় না; কেবল তাহার পেট চুলকাইয়া দিলেই সে চুপ করিয়া থাকে।”

আমি বহু গবেষণা করিয়া স্থির করিলাম যে, সম্পাদক মহাশয় আমাকে যে ছাগজাতীয় জীবের সহিত তুলনা করিয়াছেন, তাহা সমীচীন হয় নাই; যেহেতু তজ্জাতীয় জীবের ন্যায় আমার ‘মার্গ-শীর্ষে’ ক্ষুদ্র লাঙ্গূলের, মস্তকের উপর শৃঙ্গের, এবং ত্বকের উপর ঘনসন্নিবিষ্ট কৃষ্ণলোমের একান্ত অভাব। প্রকৃতপক্ষে আমি আর্য্যজীববিশেষ। সুতরাং আমার নিজের কথা বলিলেই যে প্রকারান্তরে আর্য্যজাতির কথা বলা হইল, তাহা সম্পাদক মহাশয়ের বোধগম্য হয় নাই। যাহা হউক, আমি তাঁহার বুদ্ধির অল্পতা এবাত্রা মার্জ্জনা করিয়া তাঁহার পত্রিকার জন্য এবার আমার একটি সচিত্র ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পাঠাইলাম।

আমাদের নিজ গ্রাম ও তাহার নিকটবর্ত্তী গ্রামসকল পরিদর্শন করিয়া বহু আয়াসে এই ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লেখা হইয়াছিল। ইহার মধ্যে পল্লীপথপার্শ্বস্থ তরুতলে দক্ষিণরায়ের মুণ্ডের এবং শস্যশ্যামল প্রান্তরের অনেকগুলি চিত্র ছিল। গ্রামের মদনমোহনজীউর বারোয়ারী উপলক্ষে এক বৎসর গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা হইয়াছিল। তাহার বর্ণনা, এবং দূতীবেশে বেহালা কাঁধে গোবিন্দ অধিকারীর চিত্র দেওয়া হইয়াছিল। আর নিকটবর্ত্তী ভূষণ্ডী গ্রামের বিখ্যাত তর্জার দলের কবি শ্রীবল্লভের প্রপিতামহের রচিত রাসলীলা বিষয়ক একখানি কীটদষ্ট প্রাচীন পুঁথির একপৃষ্ঠার লাইন-ব্লক ছবি দেওয়া হইয়াছিল। সম্পাদক মহাশয় সাগ্রহে আমার এই সচিত্র ভ্রমণ-বৃত্তান্ত তাঁহার পত্রিকায় মুদ্রিত করিয়া পত্রদ্বারা আমাকে তাঁহার শত শত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন।

ইহার কিছুদিন পরেই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে আমার নিকট অনুরোধ আসিল যে, উক্ত পুঁথিখানি যথামূল্যে সংগ্রহ করিয়া এডিট্ করিয়া দিতে হইবে। বলা নিষ্প্রয়োজন, আমি তাহা করিয়া পরিষদের নিকট বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলাম। পরিষদের কোন কোন অধ্যক্ষ বলিয়াছিলেন যে, আমার ঐ এডিশনের মধ্যে সর্ব্বত্রই মৌলিক আদিরসকে আত্মন্তমধ্যরস করিয়া সর্ব্বাঙ্গীন ফুটাইয়া তোলা হইয়াছিল, এবং তাহার কোথাও বস্তুতন্ত্রের অভাব হয় নাই। আমি জানিতাম, যে-কথা সাধারণ ভাবে বলিলে অশ্লীল বা রুচিবিরুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা, তাহা প্রাচীন কাব্যের দোহাই দিয়া কৃষ্ণপ্রেমের আবরণে প্রকাশ করিলে সকলেই বিশেষ রুচিপূর্ব্বক উদরস্থ করে। কারণ, "দেবতার বেলা লীলাখেলা, পাপ লিখেছে মনুষ্যের বেলা।" এই এডিশনে সাধারণে আমার বিদ্যার পরিচয় পাইয়াছিল। তবে ইহা যে কোন্ শ্রেণীর বিদ্যা তাহা বলিতে পারি না।

মাদক দ্রব্যের ন্যায় বিদ্যাকেও মোটামুটি দুই শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে। এক শ্রেণীর বিদ্যা stimulant, তাহা পেটে পড়িলেই ব্রাণ্ডীর ন্যায় উত্তেজনা করে এবং চালচলনে একটু ছুটাছুটির ভাব আনিয়া দেয়। যথা, পাশ্চাত্য বিদ্যা। কোন জাতির উদরের মধ্যে এই বিদ্যা প্রবেশ করিলে তাহারা রেলওয়ের এঞ্জিনের মত ভালমন্দ পথে অবিরাম হুটপাট্ করিয়া ছুটিতে থাকে। আমাদের ইয়ং বেঙ্গলের পেটে এই বিদ্যা ঢুকিয়া তাহাদিগকে উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছে। নেশার ঝোঁকে তাহারা সমাজের সমস্ত ওলট্-পালট্ করিয়া দিতেছে, গুরুজনদিগকে ওলড্ ফুল্ বলিয়া ডোণ্ট কেয়ার করিতেছে। তাহাদিগের দৌরাত্ম্য

নিবারণের জন্য কর্ত্তৃপক্ষ ও সমাজের নেতাগণ একযোগে চেষ্টা করিতেছেন। শুঁড়ির দোকানে মদের বোতল সাজান থাকে; আর মাতালকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য দোকানের সম্মুখে সরকারী রাস্তার উপর পুলিস মোতায়েন থাকে। আমার মনে হয়, এদেশের ইংরাজী স্কুল-কলেজগুলি এইরূপ শুঁড়ির দোকান। ইয়ং বেঙ্গল এইখানে পাশ্চাত্য বিদ্যার ডোজ্ টানিয়া রাজনৈতিক পথে পদার্পণ করিয়া বিপন্ন হয়। এ বিদ্যা পাশ্চাত্যজাতির পেটেই সহ্য হয়। এদেশবাসীর ইহা সেবন করা অকর্ত্তব্য।

সে কারণে ভারতবাসীর জন্য আমি আর এক শ্রেণীর বিদ্যাকেই শ্রেয়ঃ বলিয়া বিবেচনা করি। ইহা প্রাচীন প্রাচ্য বিদ্যা। গঞ্জিকা ও অহিফেনের ন্যায় এই বিদ্যা ভিতরে প্রবেশ করিলে দেহ ও মনের চাঞ্চল্য দূর করে। ইহার তুল্য sedative বা অবসাদক নেশা আর নাই। সেকালে এদেশের মনীষিগণ সাংখ্য-পাতঞ্জলের ছিলিমে দম লাগাইয়া বুঁদ হইয়া সূক্ষ্ম চৈতন্যের সূতা দিয়া পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার যোগ করিয়া বসিয়া থাকিতেন, আর কোন গোলযোগ বাধাইতেন না। কেহ কেহ বা কলাপ-পাণিনির কালাচাঁদে মৌজ করিয়া দিবারাত্র যত্ব-ণত্ব বকিতেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা বিশেষ রসগ্রাহী ছিলেন, তাঁহারা নিয়ত মুক্তকচ্ছ হইয়া গোপীভাবে প্রেমরসে 'বিভোরা' হইয়া থাকিতেন। প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ অধ্যাপকমহলে অধুনা সালঙ্কার অভিনন্দন রচনায় ঈষৎ প্রকোপ দৃষ্ট হইলেও, পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিদ্যার মাদকতায় যে পলিটিকাল্ লম্ফ-ঝম্প ও চীৎকার-ফুৎকার আনয়ন করে, তাঁহাদের মধ্যে তাহার সম্পূর্ণ অভাব। আমাদিগের ইংরাজী অনভিজ্ঞ বৃদ্ধ প্রপিতামহগণ এ সকল উৎপাত

জানিতেন না। তাঁহারা আমাদিগের অপেক্ষা লক্ষগুণে সুখী ছিলেন। আমরা পাশ্চাত্য বিদ্যা শিখিয়া আজ অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছি। মেকলে সাহেব ঝকমারী করিয়া এই বিদ্যা চলিত করিয়া গিয়াছেন। এখন আমাদিগকে তাঁহার ঝকমারীর মাশুল গণিয়া দিতে হইতেছে।

বিশেষ অর্থদণ্ড দিয়া যে এই আধুনিক বিদ্যা লাভ করিতে হয়, তাহা সকলেই জানে। প্রতাপনগরের জমীদার বিশ্বম্ভর বাবুর মধ্যমপুত্র সুরেন্দ্রনারায়ণকে ইংরাজী লেখাপড়া শিখাইতে লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। এক গোরা মাষ্টারই বেতনরূপে পঞ্চাশ হাজার টাকা লইয়াছিলেন। তাঁহার নিকট বিদ্যা শিখিয়া কুমারসাহেব দু'এক বৎসরের মধ্যেই অনেক পরিমাণে বাঙ্গালা ভুলিয়া যাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি যখন বিলাত হইতে মেম বিয়ে করিয়া সিভিল এঞ্জিনিয়ার হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়া পিতার চরণে সেলাম করিলেন, তখন আর বৃদ্ধের আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার জন্য সকল অর্থব্যয় সার্থক জ্ঞান করিলেন। কালে কুমারসাহেবের পাঁচটি লাল বর্ণের সন্তান হইয়াছিল। ইহারা বড় হইয়া বঙ্গদেশকে পিতৃভূমি, এবং ইংলণ্ডকে মাতৃভূমি বলিত, এবং জাতির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে বলিত, "হামরা বেঙ্গালী আছে"। তাহারা কুমারসাহেবের সঙ্গে একবার এক সভায় গিয়াছিল। সেখানে যখন সকলে 'বন্দে মাতরং' ধ্বনি করিতে লাগিল, তখন তাহারা 'হিপ্ হিপ হুরে' বলিয়া চীৎকার করিয়াছিল।

কুমারসাহেব ও তাঁহার পিতাসাহেব বলিতেন, "বিদেশীর সঙ্গে রক্তের সংমিশ্রণ না হইলে বাঙ্গালীজাতির উন্নতি হইবে

না। সকলের পক্ষে বিদেশে গিয়া বিদেশিনী সংগ্রহ করিয়া আনা সম্ভরপর নহে। কিন্তু ইচ্ছা করিলে অনেকেই নিজ নিজ গৃহে বিদেশী জামাতার সাহায্যে উপযুক্ত সন্তান উৎপাদন করাইয়া লইতে পারেন। আমাদের জাতীয় ইউজেনিক্সের কঠিন সমস্যা সহজে মীমাংসা করিয়া লইবার ইহাই প্রকৃষ্ট উপায়।" লাখ টাকা খরচ করিয়া লেখাপড়া না শিখিলে এরূপ জ্ঞানবুদ্ধি হয় না। এ জ্ঞান হার্বার্ট স্পেন্সারের ছিল না। তিনি জাপানীদিগকে ইউরোপীয় জাতির সহিত রক্ত-সংমিশ্রণ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে পণ্ডিত-মূর্খ বলি।

তবে স্বল্পব্যয়েও যে আজকাল বিদ্যাশিক্ষা হয় না, এ কথা বলিতে পারি না। বাগবাজারের বাক্যবিশারদ অতি অল্প-ব্যয়ে বিদ্যার্জ্জন করিয়াছিলেন। অনেকে বলিত, তিনি ধান দিয়া লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যে একজন উচ্চ-দরের স্বজাতিসংস্কারক তাহার আর সন্দেহ নাই। সকল সভায় ও সংবাদপত্রে তিনি তাঁহার ওজস্বিনী ভাষায় সর্ব্বদা স্বদেশ-বাসীর অধঃপতনের চিত্র নানাবর্ণে অঙ্কিত করিতেন। বাঙ্গালী জাতি যে কিরূপ স্বদেশদ্রোহী, স্বার্থপর ও চরিত্রহীন, তাহা তিনি মেকলে সাহেবের বচন উদ্ধৃত করিয়া অকাট্যভাবে প্রমাণ করি-তেন। তিনি জানিতেন যে, সাহেবদিগের সভায় কেহ তাঁহা-দিগের জাতীয় চরিত্রের দোষ দেখাইয়া বা নিন্দা করিয়া বক্তৃতা করিতে উঠিলে তাহাকে তাঁহারা চাবুক লইয়া তাড়া করেন। তিনি বলিতেন, "সাহেবদের ধৈর্য্য নাই। কিন্তু এদেশের লোকের ধৈর্য্য অসীম। তাই আমি তাহাদিগকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করিয়া জাগ্রত করিবার সুবিধা পাই। তাহাদিগকে stimulate করাই

আমার উদ্দেশ্য।" এতদিন যে বাঙ্গালীরা বক্তার মুখপদ্মবিনিঃসৃত স্বজাতিনিন্দার সুধা অম্লানবদনে পান করিয়া আসিত, একথা ঠিক। কিন্তু আজকাল তাহাদিগের ধৈর্য্যচ্যুতি হইতে আরম্ভ হওয়ায় এই সকল স্বজাতিসংস্কারকগণের বড়ই অসুবিধা হইয়াছে।

একদিন এক সভায় বাক্যবিশারদ মহাশয় বাঙ্গালীচরিত্রের গ্লানি করিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে stimulate করিতেছিলেন। তখন শ্রোতাদের মধ্য হইতে একজন বলিয়া উঠিল, "মহাশয়! দেখিবেন, যেন আপনার ভৎর্সনার তীব্র কশাঘাতে বাঙ্গালীজাতি রাস ছিঁড়িয়া ল্যাজ তুলিয়া উন্নতির পথে দৌড় না মারে।" আর একজন শ্রোতা বলিল, "বাঙ্গালীরা বেটো ঘোড়া, অধিক চাবুক খাইলে শুইয়া পড়িবে।" আর একজন শ্রোতা বলিয়া উঠিল, "আপনার বক্তৃতার stimulant সেবন করিয়া আমাদের নাড়ী ছাড়িয়া হিমাঙ্গ হইয়া আসিতেছে। অতএব আপনি ক্ষান্ত হউন, আর এ ঔষধ প্রয়োগ করিবেন না।" শ্রোতাদিগের বোল্‌চালে বাক্যবিশারদের বাক্যজাল আপনাআপনি গুড়াইয়া আসিল। তিনি মনে মনে বলিলেন, "এ জাতির আর উন্নতির আশা নাই।"

কতলোকে যে কত রকম বিদ্যা শিখিয়া কত রকমে তাহার পরিচয় দিতেছে এবং কত রকম ফল লাভ করিতেছে, তাহা এক মুখে বলিয়া শেষ করা যায় না। গোপাল সরকারের পুত্র কৃষিবিদ্যার কলেজে অধ্যয়ন করিয়া ডেপুটি হইয়া ধান কাটার মোকদ্দমার বিচার করিতেছেন। যিনি এরূপ মোকদ্দমার বিচার করিতে বসিবেন, তাঁহার পেটে কিঞ্চিৎ কৃষিবিদ্যা থাকা নিতান্তই আবশ্যক। নিতাই দত্তের শ্যালক ইটালী হইতে কলাবিদ্যা শিখিয়া আসিয়া এদেশে তাহার চাষ-আবাদ করিয়া

কেবল দগ্ধ-কলা ভক্ষণ করিতেছেন। যে মুক্ত বায়ুতে কলাবিদ্যার গাছ বর্দ্ধিত হইয়া সুফল উৎপাদন করে, এদেশে তাহার অভাব। রামচন্দ্র ভদ্র উচ্চদরের সঙ্গীতবিদ্যা লাভ করিয়া মেছুয়া-বাজারের মুন্না বাইজীকে গান শিখাইয়া থাকেন; নচেৎ রাম-ভদ্র দাদার দৈনিক মদ-গাঁজার খরচ জুটে না। যতীন বসু এম্, এস্-সি পাশ করিয়া ঘরে হাঁড়ি ঢন্ ঢন্ বলিয়া পঁচিশ টাকা বেতনের চাকরীর উমেদার হইয়া ঘুরিতেছেন, কিন্তু সকল আফিসেই "no vacancy"। বগলাপ্রসাদ জ্যোতিষী কাশীধামে জ্যোতিষবিদ্যা শিক্ষা করিয়া সম্প্রতি সংবাদপত্রে ছাপাইবার জন্য জার্ম্মাণীর পরাজয় ও লর্ড কিচেনারের * কোষ্ঠী গণনা করিতেছেন। ডাক্তার নবীনচন্দ্র বড়াল এম্, বি, মেডিকেল কলেজে চিকিৎসা-বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া ধাতুদৌর্ব্বল্যের অবধৌতিক পেটেণ্ট ঔষধ বাহির করিয়া তাহা জাহির করিতেছেন, যেহেতু কেবল এল্যো-প্যাথীতে আর কুলায় না। আর, চুরিবিদ্যা শিখিয়াছিলেন ঔপন্যাসিক অবিনাশ বটব্যাল। ইনি ফরাসী ও জার্ম্মাণ লেখক-দিগের কেতাব বেমালুম আত্মসাৎ করিয়া সুন্দর সুন্দর উপন্যাস ও নবন্যাস লিখিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, "চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা, যদি না পড়ে ধরা।"

এ সকল হচ্ছে অর্থকরী বিদ্যার কথা। এ বিদ্যার সঙ্গে বুদ্ধির বড় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ—উভয়ে উভয়ের মাসতুতো ভাই। এ দুই ভাইয়ের মধ্যে কে বড়, কে ছোট, তাহা সর্ব্বত্র ঠিক করিয়া উঠা যায় না। অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়, বুদ্ধি বড় ভাইয়ের মত আগে আগে দৌড়াইতেছে, আর বিদ্যা ছে

* যখন এই পরিচ্ছেদ লেখা হয় তখন লর্ড কিচেনার জীবিত ছিলেন।

ভাইয়ের মত তাহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিতেছে। অনেক চতুর লোক বিদ্যার অভাব বুদ্ধির দ্বারা ঢাকিয়া লয়। শুনিয়াছিলাম, এক বড়লোক অন্ধ ছিলেন। কিন্তু তিনি সকলকে জানাইতে চাহিতেন যে, তাঁহার সংবাদপত্র পড়িবার মত বিদ্যা ও দর্শনশক্তি আছে। তাই তিনি রঙ্গীন চশ্‌মার দ্বারা দুই চক্ষু ঢাকিয়া তাহার সম্মুখে খবরের কাগজ ধরিয়া থাকিতেন। নূতন লোক আসিয়া বুঝিতে পারিত না যে তাঁহার বিদ্যা ও দৃষ্টির অভাব। একদিন তিনি কাগজ উল্টা করিয়া ধরিয়া ধরা পড়িয়া বেয়াকুব বনিয়াছিলেন। ইনি বলিতেন, বিদ্যা অপেক্ষা বুদ্ধি বড়।

পেটে অধিক বিদ্যা থাকিলেও কোন কোন ক্ষেত্রে তাহাকে ধামা ঢাকা দিয়া বুদ্ধির হাঁড়ি খুলিয়া দিতে হয়। উদাহরণ স্বরূপ একটি পুরাতন গল্প মনে পড়িতেছে। এক বৃদ্ধ ঘটিরাম ডেপুটি তাঁহার এম্, এ, পাস-করা পুত্রকে চাকরীর জন্য বড়সাহেবের কাছে লইয়া গিয়াছিলেন। সাহেব "Hallo Babu !" বলিয়া খাতির করিলেন। বাবুও একটি আপাদমস্তক সেলাম করিয়া সাহেবকে অভিবাদন করিলেন। তাঁহার সঙ্গে যুবকটি কে, সাহেব তাহা জানিতে চাহিলে, ডেপুটি বাবু, "My son, sir !" না বলিয়া, বলিলেন, "I son, sir !" ডেপুটির মুখে Kiplingএর বাবু-ইংলিশ শুনিয়া সাহেব মহা খুসী হইলেন। বাবু তখন পুত্রকে সাহেবের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া বলিলেন, "Your future servant, sir ! If Your Honour will graciously give him some post, then we father and son will be two generations servant, sir !" সাহেব শুনিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, এবং ডেপুটিবাবুর পুত্রের চাকরীর আশা দিলেন।

বিদ্বান্ পুত্র জানিতেন যে, তাঁহার বাপের ভাল ইংরাজী জানা ছিল। সুতরাং সাহেবের সম্মুখে বাপের মুখে ঐরূপ ভয়ানক ভুল ইংরাজী শুনিয়া তিনি রাগিয়া টঙ্ হইয়াছিলেন। বাহিরে আসিয়া তিনি বাপকে বলিলেন, "ছি ছি বাবা! আপনি অমন ভুল ইংরাজী বলাতে আমার মাথা কাটা গিয়েছে।" বাপ বলিলেন, "ও হে বাপু! বড়র কাছে ছোট হোতে হয়, পণ্ডিতের কাছে মূর্খ সাজতে হয়, তবে কাজ পাওয়া যায়। সাহেবদের কাছে এতদিন 'I son, sir!' করেই আমি এত বড় ডেপুটি হয়েছি। কেবল বিদ্যা থাকিলেই হয় না, বুদ্ধি থাকা চাই।"

ঘটিরামবাবু খাঁটি কথাই বলিয়াছিলেন। সাহেবেরা মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াই ইংরাজী বলিতে আরম্ভ করেন। আর বাঙ্গালীদের ইহা পেটের দায়ে সাধা বিদ্যা, এবং পেটের দায়েই ইহা ব্যবহার করিতে হয়। এই জন্যই ইংরাজী ভাষা বাঙ্গালীদের মুখ দিয়া বাহির না হইয়া প্রায়ই নাক দিয়া বাহির হয়। আফিসের বড়বাবু সাহেবের কাছে নাকী সুরে কথা বলেন। বাঙ্গালী সম্পাদক সংবাদপত্র লেখেন অনুনাসিক স্বরে। হাকিমসাহেবের এজলাসে বাঙ্গালী উকিল ব্যারিষ্টার সওয়াল-জবাব করেন প্রায়ই অনুনাসিক স্বরে। লাট-মজলিসেও বাঙ্গালী মেম্বরের অনুনাসিক স্বর বাহির হয়।

কিন্তু বঙ্গভাষা 'দীনাহীনা পিঁচুটিনয়না' হইলেও, তাহা বাঙ্গালীর মাতৃভাষা। সুতরাং তাহা তাহার মুখ হইতে দেশ কাল পাত্র বুঝিয়া বিশেষ তেজের সহিত নির্গত হয়। বাঙ্গালী যখন তাহার জাতভাইকে ক্রোধে গালি দিতে থাকে, অথবা অন্দরমহলে স্ত্রীর কাছে বীরত্বের অভিনয় করে, তখন তাহার

মাতৃভাষা যে কতদূর ওজস্বিনী, তাহা কাহারও বুঝিতে বাকী থাকে না। তাই বাঙ্গালী তাহার নিজের কোটে ইংরাজী ভাষাকে প্রবেশ করিতে দিতে রাজী নহে। মিসনারী ও ব্রাহ্মগণ বিধর্ম্মী বালিকা-বিদ্যালয় খুলিয়া বাঙ্গালীর মেয়েদিগকে ইংরাজী শিখাইয়া সর্ব্বনাশ করিতেছে দেখিয়া, সমাজের নেতাগণ তাহার প্রতিকারের উপায় করিয়াছেন। তাহা হচ্ছে মহাকালী পাঠশালা, অর্থাৎ বাঙ্গালী মেয়েদের ধর্ম্মশিক্ষার বিদ্যালয়।

আমাদের গ্রামেও বালিকাদিগের জন্য একটি মহাকালী পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছিল। এই পাঠশালায় বালিকাদিগকে পাঠের মধ্যে বর্ণপরিচয় প্রথমভাগ, এবং শিবপূজা, সেঁজুতী ও অন্যান্য যাবতীয় নিত্যকর্ম্মপদ্ধতি হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়া হইত। বালিকাগণ যখন চন্দন মাখিয়া দল বাঁধিয়া সমস্বরে সুর করিয়া স্তব পাঠ করিত, তখন সকলে মোহিত হইয়া যাইত।

একবার এই পাঠশালার পারিতোষিক বিতরণের সময় আমি উপস্থিত ছিলাম। এই উপলক্ষে কলিকাতার বড় আদালতের একজন প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী হাকিম সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন—"বাঙ্গালী বালকদিগকে ইংরাজী শিক্ষা দিয়া যে কি কুফল ফলিয়াছে, তাহা আমরা সকলেই অবগত আছি। অতএব আমাদের মেয়েদের আর ইংরাজী শিক্ষা দিয়া সর্ব্বনাশ করিতে রাজী নহি।" আমি ইংরাজীনবীশ সভাপতি মহাশয়ের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া হাঁ করিয়া তাঁহার বক্তৃতা গিলিতেছিলাম। তাঁহার এই কথা শুনিয়া আমার জ্ঞান চক্ষু খুলিয়া গেল; বাঙ্গালী যে ইংরাজী শিখিয়া কিরূপ গর্ভস্রাব হয়, তাহা যেন চক্ষের সম্মুখে প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলাম। বক্তৃতা

অন্তে পারিতোষিক বিতরণের পর আমি গাত্রোত্থান করিয়া সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলাম, এবং বালিকাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম—

"মা লক্ষ্মীসকল ! তোমাদের বিদ্যাশিক্ষা কেবল বিবাহ পর্য্যন্ত। শীঘ্রই তোমাদের বিবাহ হইবে। তখন তোমরা আর পাঠশালায় আসিতে পারিবে না। তখন হইতে তোমাদিগকে লক্ষ্মী বউ হইয়া ঘরের মধ্যে থাকিতে হইবে। গৃহলক্ষ্মী হইয়া তোমাদিগকে মেয়েলী শাস্ত্রমতে সকল রকম হিন্দু আচার ও নিয়মকর্ম্ম রক্ষা করিতে হইবে। তোমাদের কাহারও কাহারও স্বামী যদি ব্যবসা-বাণিজ্য বা স্বদেশের কাজের জন্য ভারতবর্ষের বাহিরে কোন ম্লেচ্ছদেশে চলিয়া যান, তাহা হইলে বুঝিবে যে তাঁহাদের ধর্ম্ম নষ্ট হইয়াছে। তোমরা তখন তাঁহাদের সহধর্ম্মিণী না হইয়া, গৃহ-ধর্ম্মিণী হইয়া গৃহে ঘরকন্না করিতে থাকিবে ! বিদেশে স্বামীর নিকট গমন করিলে তোমাদিগেরও ধর্ম্মনষ্ট হইবে। তবে স্বামী যদি আবার দেশে ফিরিয়া আসিয়া গোবর খাইয়া গৃহ প্রবেশ করিতে স্বীকার করেন, তখন তোমরা পুনরায় তাঁহার সহধর্ম্মিণী হইবে। এরূপ স্থলে স্বামীর একটু গোবর খাওয়া বিশেষ আবশ্যক। গোবর অতি উৎকৃষ্ট জিনিস। এই জন্যই আমি আমার নামের গায়ে চিরদিনের জন্য গোবর লাগাইয়া রাখিয়াছি। সকলে আমাকে 'গোবর গণেশ' বলে। গোবরের তুল্য পবিত্র শোধক দ্রব্য আর নাই। সাবান ব্যবহার করিলে হিন্দুধর্ম্ম নষ্ট হয়। তাহা চর্ব্বি দিয়া তৈরী হয়। অতএব তোমরা সাবানের পরিবর্ত্তে গোবর ব্যবহার করিবে। হাত পা ধুইবে গোবর দিয়া, কাপড় কাচিবে গোবর দিয়া; সাবানের পরিবর্ত্তে গায়ে গোবর মাখিয়া

গা ধুইবে। গোবরই আমাদের স্বদেশী সাবান। আর তোমরা এই পাঠশালায় যেরূপ সুন্দর নিত্যকর্ম্মপদ্ধতি শিক্ষা করিতেছ, তাহাতে আমার আশা হয়, তোমরা অচিরে ঘরে ঘরে সকলকে পূজা পাঠ ও শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি করাইতে সক্ষম হইবে; সেজন্য আর ভট্টাচার্য্য পুরোহিতের আবশ্যক হইবে না। কিন্তু তোমাদিগকে এই কার্য্য করিতে হইলে মস্তকে এক-একটি শিখা ধারণ করিতে হইবে। আমি আশা করি, মহাকালী পাঠশালার ছাত্রী হইয়া তোমরা তাহা অনায়াসে পারিবে। মস্তক মুণ্ডন করিয়া চৈতন রক্ষা করিলে তোমাদের সৌন্দর্য্যের বৃদ্ধি বই হ্রাস হইবে না।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অবস্থা ও ব্যবস্থা

সেকালের সুখ্যাতি করিতে আমার পিতামহের মুখে সর্ব্বদাই লাল পড়িত। তিনি বলিতেন,—

"আমরা ছেলে বয়সে দেখেছি, টাকায় ষোল সের খাঁটি দুধ পাওয়া যাইত; টাকায় দু'সের উৎকৃষ্ট গাওয়া ঘি পাওয়া যাইত; এক মণ উত্তম চালের দাম কখনই দু'টাকার বেশী হইত না। সেকালে যে লোক পঁচিশ টাকা মাহিনায় চাকরী করিত, সেও বাড়ীতে দোল দুর্গোৎসব করিতে পারিত। এখন যে ব্যক্তি একশ টাকা মাহিনা পায়, সেও একটা চাকর রাখিতে পারে না। তখন কবিরাজেরা কেবল পাঁচন খাওয়াইয়া ভারি ভারি জ্বর আরাম করিত। এখন হয়েছে সর্ব্বৌষধি মহৌষধি এক কুইনাইন; তাই খাইয়ে খাইয়ে ডাক্তারেরা সকলের শরীর একেবারে জেরে দিচ্ছে। সেকালে তীর্থের গুমর ছিল। তখন উইল করে শ্রীক্ষেত্র যাত্রা করতে হোত। বহু কষ্টে হাঁটাপথে পুরী গিয়ে অনেকে জগন্নাথ দেখ্‌তে না পেয়ে লাউঝাড় দেখে কেঁদে আকুল হোত। এখন রেল হয়ে তীর্থের জারিজুরি ভেঙ্গে গেছে। আজকাল বাবুভায়ারা আফিস থেকে তিন দিনের ছুটী নিয়ে জগন্নাথদেবকে দর্শন দিয়ে শ্রীক্ষেত্র পবিত্র ক'রে আসেন।"

দাদামহাশয় বলিতেন যে, সেকালের এক-একজন লোকের

আহার দেখিলে তাক্ লাগিয়া যাইত। আধমুণে কেদার চক্রবর্ত্তীর খাওয়া তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। চক্রবর্ত্তীমশাই পাকা আধ মণ আহার করিতে পারিত। এক শ্রাদ্ধ-বাড়ীর ব্রাহ্মণ-ভোজনে নাকি তাহার পাতে মাত্র পাঁচ সের লুচি দেওয়ায়, সে রাগ করিয়া পাতাখানি পর্য্যন্ত চিবাইয়া খাইয়া ফেলিয়াছিল। সেকালের লোক নাকি আখচার একশ বৎসরেরও অধিক বাঁচিত। তাহারা দশ ক্রোশ পথ অনায়াসে পায়ে হাঁটিয়া গিয়া দূরস্থ আত্মীয়ের খবরাখবর লইয়া আসিত। দাদামহাশয় বলিতেন,—

"এখন হয়েছে পোষ্টাফিস! কালি কলম দিয়ে চিঠি লিখে টিকিট মেরে ফেলে দাও, তবে খবর গিয়ে যথাস্থানে পৌঁছিবে। এখন কাহারও শ্বশুরবাড়ী একটা সামান্য খবর পাঠাতে হোলে যে টাকা খরচ ক'রে টেলিগ্রাফ করিতে হয়, সেকালে তার অর্দ্ধেক খরচে এক হাঁড়ি রসকরা সন্দেশ পাঠাতে পারা যেত। এখন সকল রকমেই আমাদের অর্থের স্থানে শনির দৃষ্টি পড়েছে।"

দাদামহাশয়ের উপযুক্ত শিক্ষিত নাতি, সুতরাং তাঁর চেয়ে এককাঠি সরেশ বলিয়া আমাকে একেবারে সত্য ত্রেতা দ্বাপরের গোঁড়া হইতে হইয়াছিল। আমরা রামায়ণ মহাভারতের সেই রাম লক্ষণ, সুগ্রীব-হনুমান ও ভীষ্মার্জ্জুনেরই বংশাবতংস, তবে সম্প্রতি কাল-মাহাত্ম্যে মরিয়া ভূত হইয়া আছি। ভূতের মুখ পিছনের দিকে থাকে। সুতরাং আমাদিগকেও পিছন দিকে মুখ করিয়া সামনের দিকে চলিতে হইবে। এইরূপেই জাতীয় উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হয়। একদিন আমার এক বন্ধু বলিলেন, "ইউরোপের লোক বিজ্ঞানবলে এরোপ্লেন তৈরী করেছে।" আমি বলিলাম, "আমাদেরও ত্রেতাযুগে পুষ্পক

রথ ছিল; রাবণ তাহাতে চড়িয়া আকাশে উড়িয়া বেড়াইত।” শুনিয়া বন্ধু বলিলেন, “ছিল না হয় রাবণেরই একখানা ছিল; তাহাতে তোমার বাপের কি?” বন্ধুবরের মুখে বাপান্ত খাইয়া আমার বিশেষ আত্মশ্লাঘা বোধ হইল। তদবধি আমি সংবাদ-পত্রে ও সকল সভামঞ্চে নাক লম্বা করিয়া আমাদের অতীত গৌরবের অতিমাত্রায় শ্লাঘা করিয়া থাকি। সেকালের রাজভোগের স্মৃতিতে ডুবিয়া থাকিলে একালের জঠর জ্বালা নিবারণ হয়। ইহা আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগী অবস্থা।

আর, সেকালের বড়াই না-করিবই বা কেন? সেকালের চালচলন, বেশভূষা, আচার-ব্যবহার, বিদ্যাবুদ্ধি, এমন কি হাসি-ঠাট্টা পর্য্যন্ত সকলই মোটা ও মজবুত গোছের ছিল। এখন সমস্তই সূক্ষ্ম হইয়া আসিতেছে। আগে লোকে বোক্ড়া চালের ভাত খাইয়া হজম করিতে পারিত; এখন সহজেই পেটে বালাম বিঁধিয়া থাকে। আগে কঞ্চির কলম দিয়া আঁকুড়ে ‘ক’ ছাঁদিতে হইত; এখনচোখে চশ্‌মা লাগাইয়া ষ্টীল্ পেন্ দিয়া পিপীড়ার ঠ্যাঙের মত হরপ লিখিতে হয়। সেকালের ঠাট্টা-বটকারা বেশ সরস ছিল, তাহাতে আদিরস যথেষ্ট থাকিত। এখন ডিফামেশন বাঁচাইয়া শালা ভগ্নীপতিকে রহস্য করিতে হয়।

সেদিন এক রেলগাড়ীতে দেখিলাম, দুইটি বাঙ্গালী যুবক সেকেণ্ড ক্লাসে চলিয়াছে। দু’জনেই সৌখীন বাবু। জরি পাড়ের ফিন্‌ফিনে পাতলা ধুতি পরা—কাছা ঝল্‌ঝল্ করিতেছে, বুটিদার মিহি মসলিনের চুড়ীদার আস্তিনের পাঞ্জাবী জামা গায়ে। সাঁচ্চা-কাজ-করা সিল্কের চাদর হাওয়ায় সর্ব্বদাই গা থেকে খসিয়া পড়িতেছে, পায়ে অর্দ্ধেক গিল্‌টিকরা পম্প্ শু, আঙ্গুলে হীরার আংটি;

গলায় গার্ড চেন, এবং হাতে ফ্যান্সি ছড়ী। একজনের ছিপ্-ছিপে দেহখানি লগ্‌বগ্‌ করিতেছে; তাহার ঘাড় ও মাথার দু'পাশ কামানো, কেবল সামনের দিকে এক গোছা লম্বা কোঁকড়া চুল—যেন 'থরকট্টা প্রেমচাঁদ' বা মুক্ষি পায়রা। আর একজনের স্থূল থল্‌থলে গজেন্দ্রগামিনীনিন্দিত তনু; তাহার সিঁতাকাটা বাবরি চুল—যেন কন্দর্প-বিরহে রতি আলুথালু বেশে আলুলায়িত কেশে হাটে মাঠে সস্তায় প্রেম বিলাইতে বাহির হইয়াছে। সেই গাড়ীতে ইউরোপ হইতে নবাগত দু'টি সাহেব ছিল। তাহারা এই দুই বঙ্গজীবকে নির্নিমেষ লোচনে অবলোকন করিয়া সাব্যস্ত করিল যে, ইহারা নিশ্চয়ই "বেঙ্গলী ফিমেল্"। একজন সাহেব বলিল, "ইহারা সম্ভবতঃ dancing girls। আমি সাহেবদের লিঙ্গবোধের পরিচয় পাইয়া বঙ্গীয় যুবকদিগের আধুনিক বেশভূষাকে ধন্য-বাদ দিলাম।

সেকালের পোষাক অসভ্যতাসূচক হইলেও তাহাতে এরূপ লিঙ্গভ্রম হইত না। চাদর নিবারিণী সভার এক অধিবেশনে বঙ্গবাসীর বেশভূষা সম্বন্ধে ভারি ডিবেট্‌ হইয়াছিল। আমাকে ধরিয়া বাঁধিয়া এই সভার সভাপতি করা হইয়াছিল। একজন সভ্য প্রস্তাব করিলেন যে, বাঙ্গালীর পোষাক খুব মোটাসোটা রকমের হওয়া আবশ্যক, তাহা বনচারী সাঁওতালদিগের মত হইলেও ক্ষতি নাই। সভ্যমহাশয় বলিলেন যে, রামলক্ষ্মণ যখন বল্কল পরিয়া বনে গিয়াছিলেন, তখন তিনিও বাঙ্গালী-জাতিকে সকলরকম বাবুয়ানায় বঞ্চিত করিয়া সম্প্রতি বল্কল পরাইয়া বনে পাঠাইতে প্রস্তুত। আর একজন সভ্য তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, "Too much hatred of

luxury implies some hatred of the arts"—অর্থাৎ, সৌখীন বাবুয়ানাকে অত্যন্ত ঘৃণা করিলে শিল্পকলাকেও কতকটা ঘৃণা করা হয়। সভ্যদিগের অনেক তর্কবিতর্কের পর আমি দাঁড়াইয়া বলিলাম,—

"বাঙ্গালী যুবকগণ সৌখীন বেশভূষা করে করুক, তাহাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই। কিন্তু আজকালকার দিনে তাহাদের কাচা আল্‌গা থাকিলে চলিবে না। এখন যেমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে হইবে। তবে আমি বাঙ্গালীর মেয়েদের বেশভূষার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু উপদেশ দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করি না। তাঁহারা অসূর্য্যম্পশ্যরূপা হইয়া অন্দরমহলে থাকিবেন। বিলাতের সফ্‌রাজেট্‌দের ন্যায় তাঁহাদিগকে ভোট পাইবার জন্য রণরঙ্গিণী বেশে রাস্তার ধারের দোকানঘরের দরজা-জানালা ভাঙ্গিতে হইবে না। সুতরাং তাঁহাদিগের জন্য দেড় হাত ঘোমটা টানা চলে এরূপ বহরের ঢাকা, শান্তিপুর ও ফরাশডাঙ্গার হাওয়ার কাপড়ের ব্যবস্থাই যথেষ্ট। ইহার উপর শ্রীচরণের জন্য তরল আল্‌তা, কপোলের জন্য রুজ্‌, কপালের জন্য সোণাপোকার টিপ, অপাঙ্গের জন্য সুর্ম্মা এবং দাঁতের জন্য কিঞ্চিৎ মিশি যোগ করিলেই সোণায় সোহাগা হইবে। আর বাঙ্গালী স্ত্রীজাতি গহনা পরিতে বড় ভালবাসেন। কোন কোন অর্থনীতিজ্ঞ সাহেব বলেন যে, এদেশে যত মোহর ও গিনির আমদানি হয়, তাহা অল্পদিনের মধ্যেই বঙ্গবাসীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া অন্তর্দ্ধান হয়; মেয়েরা তাহাদ্বারা গহনা গড়াইয়া ফেলেন। সুতরাং আমাদের কুলাঙ্গনাগণকে স্বদেশী ব্যাঙ্কবিশেষ বলা যাইতে পারে।

এই ব্যাঙ্কে এককালে অনেক সোণা ছিল বটে ; কিন্তু এখন তাহার অধিকাংশই কেমিকেল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা মাত্র। যাহা হউক, বাঙ্গালী ললনাগণ যে বিশেষ গহনাপ্রিয় তাহাতে সন্দেহ নাই। তদভাবে তাঁহারা নাকি স্বামীর সহিত কলহপ্রিয় হইয়া উঠেন। শুনেছি, মণদরে সোণা না দিলে স্ত্রী-লোকের মন পাওয়া যায় না। কিন্তু আজকাল সকল গহনাই পানে ভরা। সেজন্য আমি ঠিক করিয়া রাখিয়াছি যে, আমার বিবাহ হইলে একখানি সোণার থান ইট গড়াইয়া আমার অর্দ্ধা-ঙ্গিনীর কণ্ঠে ঝুলাইয়া দিয়া তাহার মন ভিক্ষা করিব। যদি ইহাতেও তাহার মন না পাই, তাহা হইলে সেই ইট নিজের মাথায় মারিয়া মরিব।”

একজন সভ্য আমাকে ধন্যবাদ দিতে উঠিয়া বলিলেন, “সভা-পতি মহাশয় তাঁহার ভাবী স্ত্রীর সম্বর্দ্ধনার জন্য যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা সকলেরই অনুকরণ করা উচিত।” আর এক সভ্য বলিলেন, “স্ত্রীজাতিকে সম্মান না করিলে পুরুষজাতির শৌর্য্য-বীর্য্যের স্ফুরণ হয় না। পাশ্চাত্যদেশের লোক স্ত্রীজাতিকে সম্মান করিতে জানে, তাই তাহারা বীরের জাতি হইয়াছে, তাহাদের লক্ষ্মীশ্রী হইয়াছে।” এই সকল কথা শুনিয়া আমার হাসি আসিল। আমি বলিলাম,—

“স্ত্রীজাতিকে সম্মান দেখাইবার কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নহে। আপনারা ভুল বুঝিয়াছেন। রমণীকুলের সম্মান করিয়া বীরভোগ্যা লক্ষ্মীশ্রী লাভ করিতে হয় ত সাহেবেরাই করুক। আমরা সাহেব নহি, আমরা বাঙ্গালী। শুনেছি, বিলাতে স্ত্রীলোক সম্মুখে পড়িলে সাহেব মাতালের মাতলামি স্থগিত হয় ; আর বাঙ্গালী

মাতালের সম্মুখে স্ত্রীলোক পড়িলে তাহার মাতলামির মাত্রা বাড়িয়া যায়। আমাদের দেশে গাড়োয়ানরা গাড়ী হাঁকাইয়া যাইবে, গাড়ীর সম্মুখে স্ত্রীলোক থাকিলে চীৎকার করিয়া বলিবে, 'ও মাগি! ও মাগি! সরে যা'। আমরা শুনিয়া হাসিব, গাড়োয়ানকে নিষেধ করিব না। হোলীর সময় পথে স্ত্রীলোক দেখিলে পশ্চিমদেশীয় পুরুষগণ "ছ্যা রা রা রা রা রা কবীর কবীর" বলিয়া বিশুদ্ধ খেঁউড় আরম্ভ করিয়া দিবে; আর আমরা সেই মজা দেখিয়া বাঙ্গালী জন্ম সার্থক করিব। জনমজুরেরা ভদ্র পল্লীর ভিতর ড্রেনে পিন পুতিবার সময় একযোগে সমস্বরে স্ত্রীজাতির উদ্দেশে নানাবিধ 'অতিশ্লীল' বাক্য চীৎকার করিয়া উচ্চারণ করিতে থাকিবে, আর আমাদের বাঙ্গালীর কাণে তাহা মধু বর্ষণ করিবে, আমরা তাহার প্রতিবাদ করিব না। কারণ, তাহারা স্ত্রীজাতীর প্রতি সম্বর্দ্ধনা-সূচক ধ্বনি করিয়া বাহুতে বলসঞ্চার করিতেছে। আমরা বুঝি, ইহাতে তাহাদের বীরত্বের স্ফুরণ হইতেছে। বাঙ্গালী আমরা বহুদিন হইতে পুরুষানুক্রমে এইভাবে স্ত্রীজাতির সম্মান করিয়া আসিতেছি। ভগবানও তাই আমাদের অবস্থার উপযোগী ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন।"

বাঙ্গালীদের আহার-বিহারও তাহাদের বীরত্ব ও পুরুষত্বের সম্পূর্ণ অনুকূল। বাবুভায়ারা এখন সকাল বিকাল বিস্তর বায়ু-ভক্ষণ করেন বলিয়া তাঁহাদের পেটে বায়ু জমিয়া চোঁয়া ঢেঁকুর মারিতে থাকে। সেকারণে প্রাতে ঝোল-ভাত এবং রাত্রে দুধ-সাগু ভিন্ন তাঁহাদের পেটে আর কিছুই হজম হয় না। এই লঘু পথ্যকেও একপ্রকার বায়ু ভক্ষণ বলিলে চলে। মাছমাংস অগ্নি-মূল্য হওয়ায় অনেকেই দায়ে পড়িয়া vegetarian বা নিরা-

মিষভোজী হন। পাছে পরজন্মে ব্রাহ্মণের ঘরের বিধবা হইতে হয়, এই ভয়ে কেহ কেহ ঝোলের বাটির তলায় কণিকা-মাত্র মৎস্যের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। শাস্ত্রে আছে, 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পীবেৎ।' কিন্তু 'চুরিং কৃত্বা মাছমাংস খাবেৎ' এরূপ কথা শাস্ত্রে লেখে না। সুতরাং বাঙ্গালী মাছমাংস জগন্নাথ দেবকে দিয়া বর মাগিয়া অম্লরোগ আনিয়াছে।

বাঙ্গালীরা নিরামিষ সাত্ত্বিক আহার, এবং ভক্তি ও প্রেমরস পছন্দ করে। এই আহার হইতেই এই রস বৃদ্ধি পায়। বখ্তিয়ার খিলিজী যখন বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন, তখন গৌড়াধিপ লক্ষ্মণ সেনের রাজসভায় নিরামিষ বৈষ্ণব রস কিছু প্রবল হইয়াছিল। তাঁহার সৈন্যাধ্যক্ষ ও তোপখানার অধ্যক্ষগণ তখন জয়দেব গোস্বামীর চেলা হইয়া তাঁহার সঙ্গে কীর্ত্তনে মাতিয়া করজোড়ে গাহিতেছিলেন—"স্মর-গরল-খণ্ডনং মম শিরসি মুণ্ডনং দেহি-পদ পল্লবমুদারম্।" তাই বখ্তিয়ার খিলিজীসাহেব আসিয়া তাঁহাদের শিরোমুণ্ডন ও তক্রভক্ষণ করিয়া তদুপরি পদপল্লব রক্ষা করিলেন। 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতু তাদৃশী'।

ইংরাজী শাস্ত্রে লিখিত আছে—Animal food for those, who will fight and die; and vegetable food for those, who will live and think—অর্থাৎ যাহারা যুদ্ধ করিয়া মরিবে, তাহারা মাছমাংস খাইবে; আর যাহাদিগকে বাঁচিয়া থাকিয়া চিন্তা করিতে হইবে, তাহারা নিরামিষ আহার করিবে। লড়াই করিয়া মরিবার জন্য বঙ্গীয় জীবের সৃষ্টি হয় নাই। সুতরাং নিরামিষ আহারই তাহার পক্ষে প্রশস্ত; যেহেতু তাহাকে বাঁচিয়া থাকিয়া অনেক think

করিতে হইবে, অনেক ভাবিতে হইবে। তাহাকে ভাবিতে হইবে চাকরীর ভাবনা, না হইলে দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার বন্ধ হইয়া যাইবে। তাহাকে ভাবিতে হইবে একপাল ছেলের ভাবনা; কারণ, তাহার সংসারে ষষ্ঠীর দৃষ্টি আছে। যেখানে লক্ষ্মীর দৃষ্টির অভাব, সেখানে ষষ্ঠীর দৃষ্টি পূর্ণমাত্রায় থাকে। ধনবানের ঘরে প্রায়ই পোষ্যপুত্র লইতে হয়; দরিদ্রের ঘরে চারিদিকেই চ্যাঁ ভ্যাঁ। মা ষষ্ঠীর কৃপায় বাঙ্গালীর বংশ নির্ব্বংশ হইবার সম্ভাবনা নাই।

তবে সুবিধা এইটুকু যে, বাঙ্গালীবাবুকে সমাজের ভাবনা বা দেশের ভাবনা ভাবিতে হয় না। তাহার সে ভাবনা ভাবিবার ফুরসদ্ কোথা? প্রাতে পাওনাদারদের সঙ্গে বকাবকি করিতেই তাহার আফিসের বেলা হইয়া যায়। আর সন্ধ্যার পর আফিস হইতে আসিয়া তাহাকে ঘোষবাবুদের বৈঠকখানায় কনসার্ট পার্টির আখড়ায় একটু তবলায় চাঁটি দিতে হয়, অথবা শিঙায় ফুঁ দিতে হয়। যতদিন এই শিঙা আছে, ততদিন তাহার একটা উপায় আছে—শিঙা হারাইলেই চক্ষুস্থির! অথবা তখন হয় ত অবস্থার মত ব্যবস্থা হইবে।

কালে কালে বাঙ্গালীর আচার-ব্যবহার অনেক বদলাইয়া গিয়াছে। সেকালে স্পর্শ-দোষে বাঙ্গালীর জাতিপাত হইত। অখাদ্যের ঘ্রাণে ঠাকুরেরা পিরালী হইয়াছিলেন। একালে কাহারও উদরের ভিতর হইতে মুরগী ডাকিয়া উঠিলে জাত্যাংশের ব্যতিক্রম হয় না; উদাহরণ স্বয়ং গোবর গণেশ শর্ম্মা। একবার এক গৃহস্থের বাড়ীতে আমাকে ব্রতের ব্রাহ্মণরূপে আহার করিতে হইয়াছিল। ভোজনান্তে আমি দ্বিগুণ দক্ষিণা দাবী করিলাম। গৃহস্থ

কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, "আমি কি যে-সে ব্রাহ্মণ? আমাকে ভোজন করাইয়া আপনি ছত্রিশটি জাতিকে ভোজন করাইবার ফল প্রাপ্ত হইলেন; অতএব আমি দ্বিগুণ কেন, ছত্রিশগুণ ভোজন-দক্ষিণা পাইতে পারি।" গৃহস্থ আমার কথা শুনিয়া নিশ্চয়ই আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছিলেন।

আমার মতে বাঙ্গালীজাতির সমাজ মহিষপ্রকৃতিবিশিষ্ট। সমাজসংস্কারকগণ ইহার উপর যতই বলপ্রয়োগ করেন, ইহার গোঁ ততই বাড়িয়া যায়। মহিষের শিং ধরিয়া টানাটানি না করিলে সে নিজের ইচ্ছায় গাড়ী টানিবে, লাঙ্গল চালাইবে। তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া লয় দিয়া কাজ করাইয়া লইতে হইবে। সমাজসংস্কার সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। বাঙ্গালীজাতির পারিপার্শ্বিক অবস্থার যেরূপ পরিবর্ত্তন হইতেছে, সমাজের মধ্য হইতে তাহার উপযোগী ব্যবস্থাও আপনা-আপনি গজাইয়া উঠিতেছে। সেকালে বাঙ্গালীর ঘরে গৌরীদান ও চেলীর পুঁটলি দান হইত, এবং অবিবাহিতা কন্যা ঋতুমতী হইলে চৌদ্দপুরুষ নরকস্থ হইত। আজকাল ঋণদায়ে প্রপীড়িত পিতা পনর বৎসরের কন্যাকেও পার করিতে পারেন না, কারণ পারের কড়ির অভাব। বহুবিবাহ ত বহুকাল পূর্ব্বেই উঠিয়া গিয়াছে। সেকালে একজন বড় কুলীন দশ বিশ গণ্ডা বিবাহ করিয়া খাতা দৃষ্টে শ্বশুরবাড়ীগুলি পর্য্যায়ক্রমে পরিদর্শন করিয়া আসিয়াই খালাস পাইতেন। একালে বিবাহ করিলে স্ত্রী আসিয়া স্বামীর ঘাড়ে চাপিয়া বসেন এবং তাহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া খোরপোষ আদায় করেন। সুতরাং এখন লোকে একটি বিবাহ করিতেই নারাজ, বহুবিবাহ ত দূরের কথা।

সামাজিক আচার-ব্যবহারের মধ্যে সভ্যাসভ্য বলিবার কিছুই

নাই। এতদিন ইউরোপে বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল না বলিয়া তাহা সভ্যপদবাচ্য হইয়াছিল। শুনা যাইতেছে, বর্ত্তমান যুদ্ধের অবসানে দেশের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্য পাশ্চাত্যদেশে আইন করিয়া বহুবিবাহ চলিত করা হইবে। ইতিমধ্যে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এই প্রস্তাব সম্বন্ধে লেখালেখি করিতেছেন। ত্রিশ বৎসরের যুদ্ধের (Thirty Years' War) পরে জার্ম্মাণীতে নাকি বহুবিবাহের পোষকতায় আইন করা হইয়াছিল। অতএব সমাজসংস্কারের অর্থ হচ্ছে, সমাজের যখন যাহা দরকার তাহাই। সমাজ নিজের সময়োপযোগী অভাব নিজেই পূরণ করিয়া লয়। কিন্তু তা বলিয়া কি সমাজসংস্কারকদিগের ব্যবসা বন্ধ হইয়া যাইবে? কিছুতেই নহে। এখনও তাঁহাদের কার্য্য আছে। এই যে আমার বয়স তিন কুড়ি পার হইয়া গেল, তথাপি কেন বিবাহ হইল না— তাঁহাদিগকে ইহার একটা বিহিত করিতে হইবে। আমি কাপড়ে কেরোসিন ঢালিয়া আগুন লাগাইয়া আত্মহত্যা না করিলে কি সমাজসংস্কারকদিগের চৈতন্য হইবে না।

পূর্ব্বে আমার অনেকগুলি সম্বন্ধ আসিয়াছিল। কিন্তু বর্ণ, গণ, গোত্র ও লেনদেনের তক্‌রার লইয়া তাহার সকলগুলিই ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। তখন কিসে আমার বংশ রক্ষা হইবে এই চিন্তাই প্রবল হইয়া দাঁড়াইল। এ রাজবংশ লোপ পাইলে দেশের একটা সমূহ ক্ষতি হইবে ভাবিয়া বন্ধুবর্গ আমাকে একটি বিধবাবিবাহ করিতে অনুরোধ করিলেন। সুতরাং আমি সমাজসংস্কারকদিগের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলাম। গবেষণা করিয়া বুঝিলাম যে, সমাজে বিধবাবিবাহ চলিত না থাকায় বাঙ্গালীজাতিকে কাপুরুষ হইতে হইয়াছে। বাঙ্গালী ভাবে, যদি তাহাকে সৈনিক

হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হয়, তাহা হইলে তাহার অনাথিনী বিধবা পত্নীর কি উপায় হইবে? তাহাকে যে চিরদিন বৈধব্যানলে জ্বলিতে হইবে। তাহার একাদশীর পরদিনে দ্বাদশীর জলযোগ যোগাইবে কে? পাশ্চাত্যজাতীর মনে এ দুশ্চিন্তা আসিতে পারে না। সুতরাং আমি স্থির করিলাম যে, স্বয়ং বিধবাবিবাহ করিয়া দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বাঙ্গালীর মরণভয় এবং বঙ্গ-রমণীর একাদশীর ভয় যুগপৎ দূর করিয়া দিব।

এই সময়ে কলিকাতায় এক বিখ্যাত শাস্ত্রজ্ঞ দ্রাবিড়ী পণ্ডিত আসিয়াছিলেন। বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে আমি তাহার মত জানিতে গেলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাঁহাকে বিধবাবিবাহ সমর্থন, না খণ্ডন করিতে হইবে? যেহেতু তিনি স্বীয় পাণ্ডিত্য-বলে শাস্ত্রীয় বচনপ্রমাণদ্বারা উভয় রকমই করিতে সক্ষম। তবে তাঁহার বিধান সর্ব্বত্রই মূল্যানুযায়ী। সুতরাং আমি বুঝিলাম, বিধবাবিবাহকে শাস্ত্রানুমোদিত করিতে হইলে অর্থের আবশ্যক। আর কেবল বিধবাবিবাহ করিলেই হইল না। শেষে সমাজে ম্যাও ধরিবে কে? তাহাতেও অর্থবলের আবশ্যক।

আমি বহু গবেষণা করিয়া বুঝিলাম যে, সরকারী উচ্চপদ লাভ করিয়া প্রচুর অর্থ ও প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিতে পারিলে সমাজে বিধবাবিবাহ, সধবাবিবাহ প্রভৃতি সমস্তই যদিচ্ছাক্রমে চলিত করিতে পারা যায়। এই সকল দক্ষ কুম্ভকার সমাজরূপ মৃত্তিকা লইয়া যাহা খুসী তাহাই গড়িতে পারেন। আমি যখন ইঁহাদের ভাগ্য লইয়া মর্ত্ত্যে আসি নাই, তখন সমাজসংস্কার করা আমার অদৃষ্টে নাই। গরীবের ঘোড়া-রোগ কেন? একবার ধর্ম্মসংস্কার করিতে গিয়া আমার যথেষ্ট আক্কেল হইয়াছিল। আবার সমাজসংস্কারের

জন্য কোমর বাঁধিয়া কি হাস্যাস্পদ হইব? এইরূপ সাত পাঁচ ভাবিয়া আমি বিধবাবিবাহের আশায় জলাঞ্জলি দিলাম।

কেহ কেহ বলেন যে, আগে সমাজসংস্কার, তার পরে পলিটিক্স। আবার অনেকে পলিটিক্যাল্ ঘোড়ার পিছনে সমাজসংস্কারের শকট জুড়িয়া দিতে চাহেন। যথা, পলিটিক্যাল্ কংগ্রেসের পশ্চাতে তাহারই মণ্ডপে প্রতি বৎসর Social Conferenceএর অধিবেশন। ইঁহারা বলেন পলিটিক্সের ঘোড়ার পিঠে জোরে চাবুক লাগাইলে সে ঊর্দ্ধপুচ্ছ হইয়া সমাজসংস্কারের শকটকে টানিয়া লইয়া দৌড় দিবে। আমি সমাজসংস্কারকে গুড্‌স্ ট্রেণ এবং পলিটিক্স্‌কে মেল ট্রেণ বলিয়া মনে করি। মালগাড়ীর মন্থর গতি, ডাকগাড়ী ঘণ্টায় ষাট মাইল ছুটে। এই জন্য অনেকেই পলিটিক্সের গাড়ীতে চড়িতে ভালবাসেন। সুতরাং আমি সমাজ-সংস্কারের গুড্‌স্ ট্রেণ্‌কে সাইডিংএ শাণ্ট্ করিয়া পলিটিক্সের মেল ট্রেণকে লাইন ক্লিয়ার দিব স্থির করিলাম।

কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী কুক্কুরজাতীয় পলিটিক্স্ ও বৃষজাতীয় পলিটিক্সের কথা বলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু ফেউ জাতীয় পলিটিক্সের নাম করেন নাই। বোধ করি, তাঁহার আমলে এ বস্তু ছিল না। ব্রিটিশ সিংহের পশ্চাতে ফেউ লাগিয়া একপ্রকার পলিটিক্স্ করা যাইতে পারে, এবং আজকাল কেহ কেহ তাহা করিতেছেন বটে। কিন্তু পশুরাজ উত্ত্যক্ত হইয়া ল্যাজের ঝাপ্‌টা মারিলেই চক্ষু অন্ধ হইবার সম্ভবনা। সুতরাং এ পথও বিপদসঙ্কুল। কিন্তু বিপদের আশঙ্কা আছে বলিয়া আমার পলিটিক্স্ ত্যাগ করিলে চলিবে না। ইহাতে অর্থ আছে, যশ আছে এবং দেশেরও কাজ হয়। গোলাপের ডালে কাঁটা, রসালের ফলে আটা চিরদিনই থাকে।

তারপর আমি অবস্থার অনুযায়ী ব্যবস্থা করিলাম। পলি-টিক্সের আফিস খোলা আবশ্যক বুঝিয়া সহরে আসিয়া সদর রাস্তার উপরে একখানি বড় দোতালা দোকানঘর ভাড়া লইয়া দেওয়ালের গায়ে সিন্দুর দিয়া বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া দিলাম,—

নমো সিদ্ধিদাতা গণেশায়।

সন ১৩১০ সাল—শুভ ১লা বৈশাখ।

শ্রীশ্রী৺মাতার প্রসাদাৎ এই কারবার করিতেছি।

আমি এই আফিস হইতে অল্পদিনের মধ্যে একখানি সংবাদ-পত্র বাহির করিয়া দিলাম। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, আমিই এই পত্রের সম্পাদক হইলাম। কিছু দিনের মধ্যে বুঝিতে পারিলাম, একার্য্যে মধ্যে মধ্যে বেশ বাজে আদায় আছে। ধাপধাড়া গোবিন্দপুরের রাজ-ষ্টেট্ লইয়া রিসিভারঘটিত গোলযোগ বাধিয়াছিল। আমি নাবালক রাজা বাহাদুরের পক্ষে সম্পাদকীয় লেখনী সঞ্চালন করিয়া একখানি তালুক কিনিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। জুয়েলার হরদয়াল ক্ষেত্রীর উপর অন্যায় রকমে অত্যধিক ইন্‌কম্ ট্যাক্স ধার্য্য করা হইয়াছে, এই মর্ম্মে আমার কাগজে দুইটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া একটি বহুমূল্য সোণার ওয়াচ ও গার্ড চেন উপ-ঢৌকন পাইয়াছিলাম। এইরূপে অনেকবার অনেকরকম লাভ করিয়াছিলাম। একবার এক গ্রন্থকারের বিরুদ্ধে লিখিয়া আমাকে একটু ঠেকিতে হইয়াছিল। প্রবন্ধ লিখিবার সময় মনে করিয়াছিলাম, তাহার নিকট হইতে কিছু বাজে আদায় হইবে। কিন্তু সে ব্যক্তি সেদিকে আমল না দিয়া উল্‌টে আমার নামে ফৌজদারী আদালতে মানহানির নালিশ কবিল। গত্যন্তর

না থাকায় আমি তাহাকে পাঁচ শত টাকা এবং অধিকন্তু আড়াই হাত নাকখত দিয়া অব্যাহতি লাভ করিলাম।

কাগজ লিখিতে লিখিতে ক্রমে আমি একজন নামজাদা 'পব-লিক্ ম্যান' হইয়া দাঁড়াইলাম। লর্ড রিপণের স্বায়ত্বশাসনের স্তম্ভ-রূপে আমাকে ইলেক্‌সনের ভবনদী পার হইয়া কয়েক বৎসরের জন্য মিউনিসিপাল কমিশনার হইতে হইয়াছিল। এই সময়ের মধ্যে মিউনিসিপালের খরচে সুবিধামত রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ করাইয়া আমি আমার স্থাবর সম্পত্তিগুলির চতুর্গুণ মূল্য বৃদ্ধি করিয়া লইয়াছিলাম। ইহা আমার কাজ হইলেও দেশের কাজ বটে; আমি ত দেশ ছাড়া নই। দুইজন মিউনিসিপাল কণ্ট্রাক্টর সর্ব্বদা আমার বাড়ীতে মোসাহেবী করিত। তাহারা আমার বাগান-বাড়ীতে একখানি সুন্দর বাংলা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিল। তাহা আজ সাত বৎসরের কথা। একাজের জন্য তাহারা আমার নিকট এতাবৎ বিল পাঠায় নাই—বোধ হয় সাহসে কুলায় নাই। আমি কমিশনার এবং সম্পাদক!

একবার আমার এক দেশনায়ক বন্ধু পলিটিক্যাল্ ডাকাতী ও নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে একটি তীব্র প্রবন্ধ লিখিয়া আমার কাগজে তাহা প্রকাশ করিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। আমি তাহা ছাপাইয়া তন্নিম্নে সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখিয়া দিলাম,—

"যে সকল পুলিসের কর্ম্মচারী এনার্কিষ্টদিগের হস্তে নিহত হই-তেছে, তাহারাও দেশের লোক। তাহাদিগেরও স্ত্রীপুত্রকন্যা আছে। তাহাদিগের অপমৃত্যুতে ইহারা অনাথ হয়। অতএব ইহাদের ভরণপোষণের জন্য দেশের রাজনৈতিক নেতাগণের চাঁদা সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। অবস্থার মত ব্যবস্থা করা চাই। তাহা না করিয়া কেবল

হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে ফাঁকা আওয়াজ করিলে কি হইবে? সরকারকেই কি চিরকাল ইহাদের ভরণপোষণের ভার লইতে হইবে?"

ইহার পরেই কেহ কেহ গুজব করিতে লাগিল—"গোবর গণেশ সি-আই-ডি হইয়াছে।" কয়েকদিনের মধ্যেই আমি ডাকে একখানি বেনামী চিঠি পাইলাম। তাহাতে একটি হাড়িকাঠ ও খড়্গ আঁকা ছিল এবং লেখা ছিল—"আপনার কাগজে বৈপ্লবিকদিগের বিরুদ্ধে যদি আর কিছু লেখা বাহির হয়, তাহা হইলে আপনাকে হাড়িকাঠে বলি দেওয়া হইবে।" পত্রখানি পড়িয়া আমি মনে মনে বলিলাম,—আমার অবস্থা না বুঝিয়া বালকেরা এরূপ ব্যবস্থা করিয়াছে। কেন, আমি কি পাঁঠা যে আমার জন্য হাড়িকাঠের আবশ্যক? পূর্ব্বে যখন আমি মাসিক পত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইতাম, তখন এক মূর্খ সম্পাদক আমাকে একবার ছাগজাতীয় জীব বলিয়া ভ্রম করিয়াছিলেন। আজ আমি স্বয়ং সম্পাদক হইয়া নিজের কাগজে উচিত কথা লিখিয়াছি। তথাপি আমার বিরুদ্ধে সেই পুরাতন অযথা অভিযোগ!

সপ্তম পরিচ্ছেদ

প্রেম ও পরিণয়

ভবের হাটে সকলে বেচাকেনা করিতে আসে। এখানে হরেক রকমের কারবার চলিতেছে। যাহাকে আমরা সংসার বলি, তাহাও একরকম কারবার—একটি ফারম্‌বিশেষ। এই ফারমের সাইন-বোর্ডে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে—"কর্ত্তা গিন্নী এণ্ড কোম্পানি"।

এই কারবারের মূলধন হচ্ছে দাম্পত্য প্রেম বা মধুর রস। Capitalist partnerরূপে স্ত্রীকেই এই মূলধন যোগাইতে হয়। তাঁহার পুঁজিতেই এই কারবার চলিয়া থাকে। স্বামী হচ্ছেন working partner অর্থাৎ শূন্য অংশীদার। সুতরাং তিনি সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত খাটিয়া গলদ্‌ঘর্ম্ম হইবেন। তাঁহার ঘর্ম্মবিন্দু সকল ঘনীভূত ও crystalised হইয়া যথাসময়ে মণি-মুক্তার আকারে তাঁহার অংশীদারের শ্রীঅঙ্গের শোভা সম্পাদন করিবে। স্বামীর ইহাই ন্যায্য লভ্যাংশ। তিনি ইহার অধিক দাবী করিতে পারেন না,—করিলে ধনী চটিয়া গিয়া মূলধন তুলিয়া লইয়া কারবার বন্ধ করিয়া দিবেন।

লাভের ভাগ লইয়াই অংশীদারদের মধ্যে মনোমালিন্য ও বিরোধ হয়। কর্ত্তা গিন্নী কোম্পানির মধ্যে এইরূপ বিরোধের নামান্তর হচ্ছে দাম্পত্য কলহ। ইহার বহ্বারম্ভ হইলেও ক্রিয়া অতি লঘু, তাই রক্ষা। বিরহান্তে মিলনের ন্যায় কলহান্তে আলি-

ঙ্গনেই সকল গোলযোগ মিটিয়া যায়; তখন কারবার আবার জোরে চলিতে থাকে।

কি কি কারণে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে বিরোধ ঘটে, তাহা সকলেরই ভাবিয়া দেখা উচিত; যেহেতু এই বিরোধে সংসারের শান্তি নষ্ট হয়। আমিও এসম্বন্ধে কিছু গবেষণা করিয়াছি। খৃষ্টানী মতে ভগবান্ আদিমানুষের পঞ্জর হইতে রমণী সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এটা কেবল কথার কথা। আমরা সকলেই স্ত্রীকে স্তোক দিয়া বলিয়া থাকি—"তুমি আমার বুকের কল্‌জে।" ফলতঃ স্ত্রী যদি পুরুষের বুকের কলিজা বা পাঁজর হইত, তাহা হইলে সংসারে দাম্পত্য কলহের অস্তিত্ব থাকিত না।

কোরাণ সরিফে লেখে যে, স্ত্রীলোকের মধ্যে আত্মা নাই। সুতরাং মুসলমানী মতে স্ত্রী হচ্ছে প্রাণহীন পুত্তলিকাবিশেষ। এটি ওয়াজিব্ কথা। অনেক ঘরে দেখিতে পাওয়া যায়, রমণী যেন পুরুষের হাতে কলের পুতুল; পুরুষ এই মাটির পুতুলকে ইচ্ছামত ভাঙ্গিতে গড়িতে ও নাচাইতে পারে। আর এক কারণেও মনে হয়, স্ত্রীজাতির মধ্যে আত্মা নাই। আমরা পুরুষ মানুষ—আমাদের আত্মা আছে; তাই আমরা জগতের যতকিছু ভাল জিনিস সর্ব্বাগ্রে আপনাদের গ্রাসে দিয়া বসি—অর্থাৎ আত্মার ভোগ লাগাই। রমণী কিন্তু ভাল জিনিস আপনার মুখে না দিয়া পরের মুখে তুলিয়া দেয়। তাহার ভিতর আত্মা থাকিলে সে কখনই এরূপ করিতে পারিত না। সুতরাং প্রমাণ হইল যে, রমণীর আত্মা নাই। এখন তাহাকে এই কথাটি বুঝাইয়া দিতে পারিলেই সংসারের সকল গণ্ডগোল চুকিয়া যায়। তাহার আত্মপ্রতিষ্ঠা বা self-assertionএর চেষ্টা হইতেই দাম্পত্য কলহের উৎপত্তি হয়।

যাহার আত্মা নাই, তাহার আবার আত্মপ্রতিষ্ঠা! যার মাথা নাই, তার মাথাব্যথা।

তবে আত্মার অভাব পূরণ করিবার জন্য ভগবান্ রমণীর বুকের মধ্যে একটি প্রকাণ্ড হৃদ্‌পিণ্ড (hypertrophied heart) দিয়াছেন। স্ত্রীলোকের এই জাতিগত হৃদ্‌রোগের জন্য পুরুষের সঙ্গে তাহার অনেক সময় বিরোধ বাধে। রমণী-হৃদয় পুরুষের সংস্পর্শে বিশেষভাবে স্পন্দিত হয়। এই হেতু স্বামীর কোনরূপ বেচাল দেখিলে স্ত্রীর প্যাল্‌পিটেশন্ ও হিষ্টিরিয়া হয়। নারী-হৃদয় প্রস্তরবৎ নিস্পন্দ হইলে পুরুষের সহস্র ত্রুটিবিচ্যুতিতেও সংসারে অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিত না।

রমণীগণ সামান্য খুটিনাটি লইয়া পরস্পরে খেয়োখেয়ি করিতে বিশেষ মজবুত, একথা পাঠিকাগণ স্বীকার করিবেন কি না বলিতে পারি না। স্ত্রীলোকদের কথায় কথায় মতভেদ ও ঝগড়া হয়, ইহা সকলেই জানে। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে, একটি বিষয়ে জগতের সকল স্ত্রীলোক একমত। তাঁহারা সকলেই বলেন, স্বামীর দোষেই স্ত্রী বিগড়াইয়া যায়। রাস্কেল স্বামী বাহিরে চরিয়া রোজ রাত্র ২ টার সময় বাড়ী আসে বলিয়াই তাহার স্ত্রী দুষ্টা হয়। স্বামী বেচারা বলিবে, তাহার স্ত্রী দুষ্টা বলিয়াই তাহাকে বাহিরে চরিয়া বেড়াইতে হয়, কারণ সংসার তাহার কাছে শ্মশান। এখন প্রশ্ন এই—দোষ কোন্ পক্ষে? পুরুষ পক্ষে না স্ত্রী পক্ষে? আমি দুষ্ট পুরুষদিগকে সমান দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া এক ভাগকে not guilty বলিব; এবং বিগড়ান স্ত্রীদিগকে দুই ভাগ করিয়া এক ভাগের স্কন্ধে ষোল আনা দোষ চাপাইব।

কেহ কেহ বলেন, jealousy বা ঈর্ষ্যাতে দাম্পত্য প্রেমের রঙ্

চড়াইয়া দেয়, তাহাতে প্রেমের পাথারে তরঙ্গ তোলে। আমি বলি, ইহা হইতে ঝড় তুফান পর্য্যন্ত আসিতে পারে, এবং তাহাতে দাম্পত্য সুখের ভরাডুবিও হইতে পারে। ঈর্ষ্যা হচ্ছে ব্যক্তিবিশেষের প্রকৃতিগত দোষ। কি পুরুষ, কি রমণী, যাহার ভিতরে ঈর্ষ্যার আগুন থাকিবে, বুঝিতে হইবে সে নিশ্চয়ই বিবাহের পূর্ব্বে ভাই-ভগ্নীকে ঈর্য্যা করিয়াছে, এবং বিবাহের পর দাম্পত্য জীবনে এই আগুন জ্বালাইয়া সে সংসারের শান্তি নষ্ট করিবে; এবং বার্দ্ধক্যে সে পালাভাবে পুত্রকন্যার উপরেও ঈর্য্যা করিতে ছাড়িবে না। কবিরাজেরা বলেন, মধুকে আগুনে চড়াইলে বিষ হয়। আমি বলি, মধুর রসকে ঈর্ষ্যার আগুনে উত্তপ্ত করিলে তাহাও বিষে পরিণত হয়।

দাম্পত্য সম্বন্ধের মধ্যে কৃতজ্ঞতার দাবী-দাওয়া চলে না। স্বামী যদি স্ত্রীর কোন উপকার করেন, এবং সেজন্য তিনি যদি কৃতজ্ঞতার দাবী করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে ঠকিতে হইবে। এই দাবী না করিলে হয় ত স্ত্রী যথেষ্ট প্রেমদানে তাঁহার নিকট অঋণী হইবেন। কৃতজ্ঞতার দাওয়া হচ্ছে প্রেমের দখল—তাহাতে মধুর রস একদম টক্ হইয়া যায়। স্ত্রীপুরুষ উভয়ের পক্ষেই একথা খাটে। খাতক-মহাজনের সম্বন্ধও স্বামীর-স্ত্রীর মধ্যে স্থান পায় না। সুরসিক ফরাসী লেখক ম্যাক্স্-ও-রেল দাম্পত্যতত্ত্বের কিছু গবেষণা করিয়াছিলেন। তিনি বলেন অর্দ্ধাঙ্গিনীকে টাকা ধার দিয়া তাহার জন্য কখনও তাগাদা করিবে না, বা তাহা ফিরিয়া পাইবার প্রত্যাশা রাখিবে না। বরং যদি তোমার স্ত্রী তাহা ফেরত দেন, তাহা হইলে সেই টাকা দিয়া একখানি সুন্দর গহনা গড়াইয়া তাঁহাকেই হাস্যমুখে উপহার দিবে। এইরূপ করিলেই

মধুর রস ওতপ্রোত থাকিবে এবং তোমার প্রাপ্য গণ্ডা সুদে আসলে আদায় হইবে।

ইতর জীবজন্তুর মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, স্ত্রী কুরূপা এবং পুরুষ সুন্দর। সিংহীর কেশর নাই, সিংহের আছে। ময়ূরের সৌন্দর্য্য ময়ূরীর অপেক্ষা অনেক অধিক। মুরগী দেখিতে নেড়া-বোঁচা, কিন্তু মোরগের পালক ও চূড়ার বাহার ধরে না। ইহাতে মনে হয়, ইতর প্রাণীর মধ্যে ভগবান্ পুরুষের উপরে স্ত্রীর মনোহরণ করিবার ভারার্পণ করিয়াছেন। কিন্তু মনুষ্যজাতির বেলায় তাঁহার বিধান অন্যরূপ। তিনি স্ত্রালোককেই রূপ ও রমণোপযোগী গুণে ভূষিতা কয়িয়াছেন। তাই স্ত্রাজাতি সাজগোজ করিতে এত ভালবাসে। ইহা দেখিয়া অল্পবুদ্ধি পাঠক হয় ত ঠিক করিয়া লইবেন, পুরুষের চিত্তবিনোদন করিবার জন্যই রমণীর সৃষ্টি। আমি বহু গবেষণার ফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, রমণী পুরুষের জন্য বেশভূষা করে না। বোসেদের ছোট বৌ যে জড়োয়া গহনায় সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া ঝক্ মারিতে থাকে, তাহা কেবল সরকারদের মেজ বৌয়ের উপর টেক্কা দিবার জন্য—তাহার স্বামীর চক্ষু ঝলসিবার জন্য নহে। স্ত্রীলোক বেশভূষার পরিপাটি করে অপর স্ত্রীলোকের ঈর্ষা উৎপাদনের জন্য। ইহা করিতে পারিলেই সে তাহার সাজগোজ সার্থক হইয়াছে বলিয়া মনে করিবে। এই-জন্য পর্দ্দা-পার্টিতে বড়ঘরের রমণীরা সাজগোজের চূড়ান্ত করিয়া আসেন; সেখানে ত পুরুষদৃষ্টির প্রবেশাধিকার নাই। স্ত্রীচরিত্রজ্ঞ রসিক ম্যাক্স-ও-রেল বলিয়াছেন, "যদি কোনদিন পৃথিবী হইতে সকল স্ত্রীপুরুষ লোপ পাইয়া কেবল দুইটিমাত্র রমণী অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে ঐ দুইজনের মধ্যে তখন অবিরাম বেশভূষার সংগ্রাম

চলিতে থাকিবে, এবং তাহারা পোষাকের বাহারে পরস্পরকে পরাস্ত করিতে চেষ্টা করিবে।" ইহাই হচ্ছে স্ত্রীচরিত্রের বৈচিত্র্য।

স্ত্রী অভ্রান্ত বা চালচলনে অত্যধিক খাঁটি হওয়া সুবিধা নয়। যে স্ত্রী তাঁহার স্বামীর কাছে ভুলচুক্ করিয়া অপ্রস্তুত হইতে জানেন না, তাঁহাকে লইয়া স্বামী সুখী হন না। এরূপ স্ত্রী যে খুব strict হইবেন তাহার অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তিনি স্বামীর সামান্য ত্রুটিও উপেক্ষা করিবেন না, পান থেকে চূণ খসিলেই খড়্গহস্ত হইবেন। এহেন স্ত্রী যে গৃহে বিরাজ করিবেন, সে গৃহ যেন একটি বিচারালয়, স্বামী বেচারী যেন আসামী, এবং স্ত্রী যেন জজসাহেবা—সর্ব্বদাই বিচারে বসিয়াছেন। পুরুষ ও রমণীর পক্ষে সংসার হচ্ছে পদে পদে পদচ্যুতির ক্ষেত্র। এখানে দুর্ব্বলা রমণী হামেষাই ভুল করিয়া বসিবেন, এবং স্বামীর নিকট তজ্জন্য 'সাপরাধী' হইবেন; স্বামী তাঁহাকে চুম্বন দণ্ডে দণ্ডিত করিবেন। স্বামীরই দণ্ডদাতা হওয়া উচিত; তাহাতে order ঠিক থাকে।

প্রেমরোগগ্রস্ত কোনও পুরুষ যেন রমণীর পদানত হইয়া করজোড়ে না বলে "আমি তোমায় অত্যন্ত ভালবাসি"। যে আহাম্মক এরূপ করিবে, সে কিছুতেই রমণীর ভালবাসা পাইবে না—কৃপা পাইতে পারে। প্রেম নিম্নগামী—ইহার উর্দ্ধপাতন অসম্ভব। কর্পূরাদি volatile পদার্থেরই উর্দ্ধপাতন হইয়া থাকে। প্রেমকে এইরূপ বস্তু মনে করিয়া উর্দ্ধপাতনের চেষ্টা করিলে তাহাও কর্পূরের মত উবিয়া যাইবে। কৈলাস-শিখরে বসিয়া মহাদেব পার্ব্বতীকে অঙ্কে লইয়া সস্নেহে প্রেম সম্ভাষণ করিতেন। আমার মনে হয়, ইহাই প্রেমজ্ঞাপনের সঠিক চিত্র। স্ত্রী উর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিবে, স্বামী নতমুখে স্ত্রীর পানে তাকাইবে,

মধুর রস ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে পড়িবে—যথা চাতকিনীর মুখে বারি-ধারা। অতএব স্ত্রীর অপেক্ষা পুরুষের ধনে মানে, গুণে জ্ঞানে, বয়সে ও আড়ে-দীর্ঘে কিছু বড় হওয়া আবশ্যক। ম্যাক্স-ও রেল রমণীর পাণিগ্রহণ বিষয়ে এই পরামর্শ দিয়াছেন—"Marry her at an age that will always enable you to play with her all the different characteristic parts of a husband, a chum, a lover, an adviser, a protector, and just a tiny suspicion of a father.*

দাম্পত্য প্রেম কলাবিত্তানুশীলনের সহায় না অন্তরায়?—এই প্রশ্ন লইয়া বহুকাল হইতে অনেক বাদানুবাদ চলিয়া আসিতেছে। আমি বলি, ইহা ঘোর অন্তরায়। সুদক্ষ চিত্রকর নিভৃতে বসিয়া তন্ময় হইয়া চিত্র আঁকিতেছেন। সেখানে তাঁহার প্রণয়িণী আসিয়া তাঁহার গণ্ডে একটি উৎসাহসূচক চুম্বন দিয়া গেলে নিশ্চয়ই তাঁহার তুলির গতির ব্যতিক্রম হইবে। কথিত আছে এক প্রসিদ্ধ কবি তাঁহার পাঠাগারে বসিয়া কালি-কলম লইয়া একমনে কবিতা লিখিতেছিলেন। হঠাৎ তাঁহার স্ত্রী আসিয়া ধোপার হিসাব লিখিবার জন্য তাঁহার হাত থেকে একবার কলমটি চাহিয়া লইয়া গেলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে কলম ফিরিয়া আসিল বটে; কিন্তু সে কলম হইতে আর সে দিনের মধ্যে কবিতার অমৃতনিস্যন্দিনী ধারা বাহির হইল না। স্ত্রীর অঞ্চলের হাওয়ায় কবিত্বের ব্যাঘাত জন্মে। এজন্য স্ত্রীকে কবি-স্বামীর কাছ থেকে অনেক সময় তফাতে

* তোমার স্ত্রীর বয়স এরূপ হওয়া চাই, যেন তুমি একাধারে তাহার স্বামী, প্রিয়সুহৃদ, প্রেমিক, উপদেষ্টা ও রক্ষাকর্ত্তা হইতে পার। তোমার পতিত্বের মধ্যে এক রতি পিতৃত্বও থাকা দরকার।

থাকিতে হয়। তাই কবিবর বায়রণ বলিয়াছেন, কবির অর্দ্ধাঙ্গিনী হওয়ার মত স্ত্রীলোকের দুর্ভাগ্য আর নাই। কোন রসিক পাঠক হয়ত জিজ্ঞাসা করিবেন, তবে রজকিনীর অঞ্চল সঞ্চালনে মহাকবি চণ্ডীদাসের কবিতা ফুটিয়া উঠিত কি করিয়া? উত্তর—সে যে 'পরকীয়া'। পরকীয়া প্রেম আর্টের অন্তরায় নয়। বঙ্গরঙ্গমঞ্চগুলি এ কথার যাথার্থ্য প্রতিপাদন করিতেছে। এই সকল রঙ্গমঞ্চে 'পরকীয়া'-পদাঘাতের নূপুর-নিক্কণে চৌষট্টি কলা ফুটিয়া ওঠে।

পুরুষ রমণী উদ্বাহের উদ্বন্ধন গলায় পরিলে বীণাপাণি তাহাদের প্রতি কিঞ্চিৎ বাম হন। স্বামী-স্ত্রীর সংসারে আর্ট ফার্ট বেশী দিন টেঁকে না। দাম্পত্য জীবনের উপর লক্ষ্মী ও ষষ্ঠীর দৃষ্টিই ভাল। কেহ কেহ বলেন যে এখানে, বিশেষতঃ স্ত্রীর উপর সরস্বতীর দৃষ্টি তত বাঞ্ছনীয় নহে। সংস্কারবাদী বলিবেন, খনা গার্গী লীলাবতীর মত রমণী বঙ্গের ঘরে ঘরে শোভা পাওয়া কর্ত্তব্য। তা'হলেই ত চক্ষুস্থির! মার্কিণদেশে অনেকটা এই হাল হইয়া আসিতেছে। কিছুদিন হইল একজন মার্কিণ সাহেব অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিয়াছিলেন, তাঁহাদের দেশে মেয়ে ডাক্তার, মেয়ে উকিল-ব্যারিষ্টার, মেয়ে সম্পাদক, মেয়ে লেখক ও মেয়ে বক্তার সংখ্যা খুব বাড়িয়া যাইতেছে, কিন্তু "মেয়ে স্ত্রীলোক" বা female womenএর সংখ্যা বিলক্ষণ কমিয়া আসিতেছে। ম্যাক্স-ও-রেল বলিয়াছিলেন—"I would rather be the husband of a simple little dairymaid than that of a George Sand or a Madame de Stael।"* বিদ্যা এক বিশেষ

---

* বিদুষী জর্জ স্যাণ্ড বা ম্যাডাম্ দে ষ্টেলের স্বামী না হইয়া বরং আমি একটি সামান্য গোপ-বালিকার স্বামী হইতে প্রস্তুত আছি।

নেশার জিনিস। এই মাদক সেবন করিলে স্ত্রীলোক্ সহজেই উন্মত্ত হইয়া পড়ে। পুরুষ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া চেষ্টা করিলে নেশা একেবারে ত্যাগ করিতে পারে। কিন্তু স্ত্রীলোক নেশা করা একবার অভ্যাস করিলে আর জীবনে সে অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারে না। অতএব অবলাকে বিদ্যা উদরস্থ করিতে হইবে সাবধানে, টনিক ডোজে—যেন তাহাতে নেশা না হয়।

স্ত্রী-পুরুষের যৌবনে দাম্পত্য প্রেমের যেরূপ হেউ-ঢেউ চলিতে থাকে, বয়স গড়াইয়া আসিলে তাহা মন্দীভূত হয়। অধিক বয়সে শরীরের সকল রসের সঙ্গে মধুর রসও শুকাইতে সুরু করে। ডব্‌কা বয়সে যে পুরুষ তাহার স্ত্রীকে পলকে হারায়, হয় ত পঞ্চাশের পরপারে গিয়া তাহার সেই স্ত্রীর জন্য আর ততটা থাকিবে না। প্রেমের নদীতে মাত্র একবার জোয়ার আসিয়া তাহাকে কাণায় কাণায় ভরিয়া তোলে, তারপর ভাঁটা পড়িতে আরম্ভ হয়। এই ভাঁটাই শেষজীবন পর্য্যন্ত চলিতে থাকে। বার্দ্ধক্যের মরা গাঙে আর ফিরে বান ডাকে না। যখন প্রথম ভাঁটার টান দেখা দেয়, তখন স্ত্রী হয়ত তাহার স্বামীর ব্যবহারের শৈত্যে কিছু ক্ষুণ্ণ হইতে পারেন। বয়সদোষে স্বামীর ক্ষুধামান্দ্য হইয়া আসিতেছে, ইহা স্ত্রীর বোঝা উচিত। এ অবস্থায় রমণীর কর্ত্তব্য হচ্ছে, রকমারি উপাদেয় তেলাল্-ঝালাল তর্‌কারী প্রস্তুত করিয়া স্বামীর মুখের কাছে ধরিয়া তাঁহার রুচি-বৃদ্ধির চেষ্টা করা। তাহা না করিয়া তিনি যদি মানময়ী রাধে হইয়া অভিমানে বদন ফিরাইয়া বসেন, তাহা হইলে বেচারী স্বামীর প্রতি তাঁহার অবিচার করা হইবে।

অষ্টাদশ পুরাণের যুগে এদেশে বিবাহে পণপ্রথা প্রচলিত ছিল। তখন কন্যা বা কন্যার পিতা পণ না দিয়া, পণ করিয়া বসিতেন;

তাহা লইয়া স্বয়ম্বর সভা এবং লাঠালাঠিও হইত। তখন আসুরিক ও গান্ধর্ব্বাদি অনেক বিটকেল রকমের বিবাহ চলিত ছিল। তার পর মুসলমান. রাজত্বকালে হিন্দুধর্ম্ম যখন মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ডের ন্যায় তীব্র কিরণজাল বিস্তার করিয়া সমাজকে আলোকিত করিয়া তুলিল, তখন আমাদের স্বর্গীয় কর্ত্তারা মনুর মতে অষ্টমে গৌরীদান আরম্ভ করিলেন। এই সুন্দর সভ্য বিবাহপ্রথা এতাবৎ নির্ব্বিবাদে চলিয়া আসিতেছিল। দুঃখের বিষয়, আজকাল এই বিবাহের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইতেছে। এখন ব্রাহ্মদিগের দেখাদেখি হিন্দুসমাজেও বিধবা বিবাহ, love marriage ও late marriage আসিয়া পড়িতেছে। যে মধুর রস এতদিন হিন্দু-বিবাহের পরবর্ত্তী ছিল, তাহা এখন তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী হইয়া দাঁড়াইতেছে। সুতরাং পরিণয়াভিলাষী বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ ও রমণীদিগকে তাহাদের অর্দ্ধাঙ্গ নির্ব্বাচন বিষয়ে কিঞ্চিৎ পরামর্শ দেওয়া আবশ্যক হইয়াছে।

কোন কোন পুরুষ স্ত্রীজাতিকে আদৌ দেখিতে পারে না। আমি ইহাদিগকে রমণীবিদ্বেষী পুরুষ বলিব। এরূপ পুরুষকে কোন রমণীরই বিবাহ করা উচিত নয়। কোন কোন নির্ব্বোধ রমণী হয় ত বলিবেন, এরূপ নারীবিদ্বেষী স্বামী পাইলে তাহার স্ত্রীকে আর ভবিষ্যতে কখনও ঈর্ষার আগুনে পুড়িতে হইবে না, যেহেতু এরূপ পুরুষের চোখে সকল স্ত্রীলোকই বিদ্বেষের পাত্রী। এটি নিতান্ত ভুল। সকল দিকে কৃপণ না হইলে পুরুষ রমণীবিদ্বেষী হয় না। এরূপ পুরুষকে স্বামীরূপে লাভ করিয়া স্ত্রী তাহার নিকট হইতে মধুর রস আদায় করিতে পারিবেন না; সুতরাং এ বিবাহ বিড়ম্বনা মাত্র। আমার মতে, ইহা অপেক্ষা নারীভক্ত পুরুষকেই বিবাহ করা কর্ত্তব্য। হয় ত এরূপ পুরুষ প্রেম বিলাইবার উদ্দেশ্যে

একাধিক রমণীর পশ্চাতে ধাবমান হইতে পারে। কিন্তু যে ভাগ্য-বতী রমণী এহেন পুরুষপুঙ্গবকে স্বামীরূপে পাকড়াও করিয়া প্রেমের পিঞ্জরে পুরিতে পারিবেন, তিনিই জয়-পতাকা উড়াইতে সক্ষম হইবেন।

আবার যে রমণীকে বিবাহ করিতে চেষ্টা করিয়া অনেক পুরুষ ফেল হইয়াছে, তাহাকেও কোন পুরুষের বিবাহ করা কর্ত্তব্য নয়। কিন্তু প্রেমান্ধ নির্ব্বোধ পুরুষগণ কি আমার এই অমূল্য উপদেশ গ্রাহ্য করিবে? একশ্রেণীর লোক আছে, যাহারা কেবল নিলামের সময়েই মালের কিম্মৎ বুঝিতে পারে। যে মাল তাহারা পূর্ব্বে দশ টাকায় লয় নাই, তাহা নিলামে চড়িলে তখন হয় ত একশ টাকায় ডাকিয়া বসিবে, এবং তাহা তাহাদের গলায় পড়িবে। এই শ্রেণীর পুরুষ highest bid করিয়া স্ত্রীকে ঘরে আনিয়া পরে হায় হায় করে। যখন এই স্ত্রী ভয়ানক ভালবাসিয়া তাহার স্বামীকে বলিবে,—"ওগো তুমি মরে গেলে আমি আর একদণ্ডও বাঁচব না", তখন স্বামী বলিয়া বসিবে—"যদি তাই ভয় হয়ে থাকে, তবে তুমি না হয় আগেই স'রে পড়।" ফারখতের অন্য উপায় নাই।

এসকল হইল পাত্রপাত্রীনির্ব্বাচন বিষয়ের কথা। যেসকল স্থলে যুবক যুবতী প্রেমের দায়ে ঠেকিয়া পরস্পরকে বিবাহ করিতে বাধ্য হয়, সেসকল স্থলে পাত্র-পাত্রীর দোষগুণ ও জাতি-বর্ণের বিচার করা চলে না। অনেক সময় অসবর্ণ ও প্রতিলোম বিবাহ অনিবার্য্য হইয়া দাঁড়ায়। এই সকল শাস্ত্র ও দেশাচারবিরুদ্ধ বিবাহকে validate বা বৈধ করিবার সুন্দর উপায় আছে। তাহা হচ্ছে তিন আইন (Act III) বা শালগ্রাম শিলা। তিন আইন মতে বিবাহ হইলে বর-কনেকে শপথ করিতে হইবে যে, তাহারা না-হিন্দু না-

মুসলমান—না-কিছু। কোন কোন ব্রাহ্ম হিন্দুসমাজের উপর রাগ করিয়া ওঁ তৎসৎ বলিয়া এরূপ হলপ অনায়াসে করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বা হলপের অন্তর্গত 'হিন্দু' শব্দের বিশেষ অর্থ করিয়া মনকে স্তোক দেন। কিন্তু যে ব্রাহ্ম মনে করেন তাঁহার দেহের প্রত্যেক রক্তবিন্দু বলিতেছে তিনি হিন্দু,—যিনি হিন্দুর উপনিষদাদিকে নিজের ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহার পক্ষে 'আমি হিন্দু নই' বলিয়া হলপ করা বড়ই দুরূহ ব্যাপার। এজন্য কেহ কেহ এরূপ বিবাহে তিন আইন বর্জ্জন করিয়া শালগ্রাম সরবরাহ করিতে ইচ্ছা করেন; যেহেতু বিবাহকে পাকা করিবার পক্ষে শালগ্রামও তিন আইনের তুল্য বলবৎ। কিন্তু শালগ্রামের গায়ে পৌত্তলিকতার গন্ধ আছে বলিয়া নিরাকারবাদিগণ এই বস্তুর আনয়নে আপত্তি করেন। তিন আইন ও শালগ্রাম উভয়কে বয়কট্ করিয়া বিবাহ হইলে তাহা পরে-পশ্চাতে কাঁচিয়া যাইতে পারে। সুতরাং এ এক বিষম সমস্যা।

আমি এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ গবেষণা করিয়া বুঝিয়াছি যে, নিরাকারপন্থীদিগের শালগ্রামে আপত্তি করা সঙ্গত নহে। শালগ্রাম শিলা হচ্ছেন চক্ষুকর্ণাদিরহিত শূন্যাকার, শূন্যগর্ভ ও সম্পূর্ণ shapeless বিগ্রহ; সুতরাং ইহাকে নিরাকারের nearest possible approach বলা যাইতে পারে। এরূপ সাক্ষী গোপালের সম্মুখে উদ্বাহ-কার্য্য নির্ব্বাহ হইলে সমাজ ও ধর্ম্মসংস্কারের ব্যত্যয় হইবার সম্ভাবনা নাই। নিরাকারবাদিগণ যদি পরিণয়-ক্ষেত্রে শালগ্রামের উপস্থিতি লইয়া লাঠালাঠি না করেন, তাহা হইলে হিন্দুসমাজের 'নৈরাকারবাদী' * দলের সঙ্গে তাঁহাদের একটা

* Heterodox.

আপোষ এবং জাতীয় জীবনে একটা বৃহৎ একাকারের সূত্রপাত হইতে পারে।

তবে কালধর্ম্মের উপযোগী করিবার জন্য সম্প্রদান কার্য্যের কিছু পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক হইয়াছে বলিয়া আমি মনে করি। পূর্ব্বে বরের হাতে কন্যা সম্প্রদান করিয়া মেয়ের বাপ কাঁদিয়া ফেলিতেন। এখন হইতে কান্নার পালা ছেলের বাপের। কন্যার হাতে বর সম্প্রদান করিয়া তাঁহাকে বলিতে হইবে, "আজ থেকে ছেলে আমার পর হয়ে গেল।" এই কারণেই গোবর গণেশ সংহিতায় আমি বিবাহান্তে বরের গোত্রান্তরের ব্যবস্থা দিয়াছি। কিন্তু "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা, পুত্রপিণ্ডপ্রয়োজনম্" বচনটি আমার সংহিতায় ঠিক আছে। যেহেতু আমাদের সমাজে স্ত্রী হচ্ছে child producing machine অর্থাৎ পুত্রোৎপাদনের যন্ত্রমাত্র; আর, বংশের ও দেশের পিণ্ড চটকাইবার জন্যই পুত্রের জন্ম।

সম্পূর্ণ।

শ্রীযুক্ত হরিদাস হালদার প্রণীত

গোবর গণেশের গবেষণা

দ্বিতীয় সংস্করণ—পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত।

কয়েকটি অভিমত।

সাহিত্য-সম্রাট স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন ঃ—

"গোবর গণেশের গবেষণা বইখানি পড়িয়া আনন্দ লাভ করিয়াছি। ভাষায় এবং ভাবে এই গ্রন্থ তলোয়ারের মত হাল্‌কা, ঝক্‌ঝকে খরধার ও নিষ্ঠুর। এই অস্ত্রটি যাঁহার হাতে খেলিতেছে, তাঁহার নৈপুণ্য ও নির্ভীকতার পরিচয় পাওয়া গেল। মোহবন্ধন ছেদনের কাজ চলিতে থাক্‌, এই আমি কামনা করি।"

সাহিত্য-মহারথী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি,আই, ই, মহোদয় লিখিয়াছেন ঃ—

"গবেষণা বলিতে বাঙ্গালী পণ্ডিতেরা কি বোঝেন জানি না। আমি ত জানি উহার অর্থ গরু খোঁজা। গোবর গণেশ অনেক গরু খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাহাদের লেজ মলিয়া দিয়াছেন। নানা আকারে নানা বেশে, নানা ভেকে গরুতে

আত্মগোপন্ করে। তাহাদের খুঁজিয়া বাহির করা শক্ত ব্যাপার, লেজ মলা আরও শক্ত। গণেশ বাহাদুর লেজ মলিয়াই ক্ষান্ত নহেন। বেশ দু'ঘা পাঁচন বাড়ীও দিয়াছেন। ইহাতে যদি তাহাদের জ্ঞান জন্মায়, রাজা প্রজা উভয়েরই উপকার হইবে।"

Dr. Brajendranath Seal, M. A., Ph., D. says,—

"Babu Haridas Haldar's GOBER GANESHER GABESHANA is a very meritorious addition to the literature of satire in Bengali. In many places it shows on the author's part shrewd observation of social manners and a capacity for sagacious reflection. It rings many changes on the gamut of satire, from light banter to flashing wit, and from flashing wit to mordant irony. The style in its driving force and its vitriolic quality has the stamp of individuality. * * * * * The writer tells his stories with a comic zest, evinces true humour in his descriptions of the incongruous medley in the social life and manners of Bengal to-day, and sometimes indulges in flights of fancy or in a masked irony, to relieve the fierceness of the onslaught."

Mr. C. R. Das, Bar-at-Law, says,—

"GOBER GANESHER GABESHANA by Babu Haridas Haldar is a well-written satire in Bengali. The style is very fascinating, The book deserves to be widely read."

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্, এ, বি, এল্, বেদান্তরত্ন মহাশয় গ্রন্থকারকে লিখিয়াছেন ঃ—

"আপনার গোবর গণেশের গবেষণা পড়িয়া আনন্দিত হইয়াছি। ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের আবরণে আপনি অনেক কাজের কথা বলিয়াছেন এবং এমন ভাবে বলিয়াছেন যেন কথাগুলি শ্রোতার 'কাণে বাজে'। সুধু কাণে কেন, পিঠেও কয়েক ঘা বেশ মিঠে হাতে দিয়াছেন। আপনার লেখার বাহাদুরি আছে। এরূপ রচনা বাংলা ভাষা হইতে প্রায় উঠিয়া যাইতেছিল। আপনার দৃষ্টান্তে বোধ হয় আবার ফিরিয়া আসিবে।"

"*The Bengalee*" says,—

"GOBER GANESHER GABESHANA by Babu Haridas Haldar is a Bengalee book, which we could not so long review because of its unique attraction. Whoever chances his eyes on its pages got enamoured of it and pressed us hard to lend it to him for a few days. Curious to learn what could there be in a Bengalee book that cansed it an incessant round, we opened at a few pages of the publicatlon, and trnth to say that we also succumbed to the temptation, to which many of our friends had fallen a victim. The chief merit of the book, and we don't think it need possess any other, is that it knows what to say and how to say it. And as such it is an appeal to the sense of the incongruous, the most telling

weapon in the hands of literature. We had the opportunity of reading the reviews of the book by many of our eminent thinkers and we venture the opinion that they have missed the cardinal note of the book. Satire is now-a-days a very common implement. The fatuous turn of expression mostly clothes a disgusting void. But in this humourous representation of the present day Bengal we see a mortified love and pride, which even in its recoil has put forth a supreme effort to conquer. It is a ruthless dissection of hypocrisy and despicable self-complacence which by exposing to our view the writhings of an underlying patriotism has softened all the repulsive scars of its wounds into so many beautiful dimples. It has delivered its attack on all the departments of our thought and activity, and the effectiveness of the blows displays at every turn the unerring skill of the hand. Even those weaknesses of mortals that have so long formed the universal stock-in-trade of literature have been handled with refreshing novelty. No criticism can do full justice to the book, and a careful perusal alone can lead to a complete appreciation of its various beauties."

প্রবাসী—"বর্ত্তমান যুগে সাহিত্যক্ষেত্রে এইরূপ ব্যঙ্গ-পুস্তক আমাদের চোখে পড়ে নাই। লেখক প্রকৃত স্বদেশ-প্রাণ ব্যক্তি। * * এ পুস্তকে ভাবিবার শিখিবার ও

বুঝিবার অনেক আছে। * * প্রত্যেক বাঙ্গালী পুরুষ ও স্ত্রীর এই বই বার বার পড়া উচিত; লাভবান হইবেন নিশ্চয়। গোবর গণেশের লেখনীর জয় হোক!”

ভারতবর্ষ—“এই ‘গবেষণার’ লিপিচাতুর্য্যের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। গোবর গণেশ যে একজন প্রথম শ্রেণীর সমজদার ও শিক্ষক, তাহা আমরা মানিয়া লইতে অণুমাত্র কুণ্ঠিত হইব না। আমাদের সকলেরই এই বইখানি পড়িয়া দেখা উচিত, আর স্থধু পড়িলেই হইবে না, ভাবিতে হইবে।”

সবুজ পত্র—“হালদার মহাশয় আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে সমাজের অবস্থা দেখিয়ে দিয়েছেন, কেন না তাঁর ব্যঙ্গ সচিত্র —ইংরাজিতে যাকে বলে Illustrated; তিনি পাতায় পাতায় আমাদের জীবনের ও মনের ছবি এঁকে গিয়েছেন। * * * তার জন্য পাঠক-সমাজের তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। এ সেহাই-কলমের কাজ করতে পারেন এমন গুণী বাঙ্গলায় খুব কম আছে। * * এই কারণে আমি বাঙ্গালীমাত্রকেই এ বই পড়তে অনুরোধ করি।” —শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী।

ভারতী—“এই গ্রন্থে লেখক বেশ নির্ভীকভাবে আমাদের বহু দোষ ও দুর্ব্বলতার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। ধর্ম্ম, সমাজ, রাষ্ট্র ও নীতি সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে,—সব মতগুলির সহিত সকলের সহানুভূতি না থাকিলেও লেখকের নির্ভীক মতাভিব্যক্তিটুকু উপভোগ্য এবং তাহা ভাবিয়া দেখিবার মত। লেখকের আলোচনা কৌতুক-রসে মণ্ডিত। সে রসে প্রাণ আছে—তাহা নির্জ্জীব বা অক্ষম ন্যাকামির রূপান্তর নহে।”

দৈনিক চন্দ্রিকা—"গোবর গণেশের গবেষণার গ্রন্থকার —শ্রীযুক্ত হরিদাস হালদার। হালদার মহাশয় প্রবীণ সাহিত্যসেবী। তাঁহার লেখার একটা বেশ ভঙ্গী আছে। বঙ্কিমের 'কমলাকান্ত' যে ভঙ্গীতে লেখা হইয়াছিল, 'গোবর গণেশের' ভঙ্গীও প্রায় সেইরূপ। 'গোবর গণেশের' ভাব, ভাষা ও ভঙ্গী সাহিত্যিক-নৈপুণ্য ও নির্ভীকতার পরিচয় দিয়াছে। কবীন্দ্র রবীন্দ্র, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, স্বনামধন্য বেদান্তরত্ন শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রবীণ নাট্যকার পণ্ডিত ক্ষীরেদেপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতি মনীষীগণ এ পুস্তকের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। এ পুস্তকের বিস্তৃত সমালোচনার আবশ্যকতা আছে। আপাততঃ আমাদের স্থানাভাব। বিস্তৃত সমালোচনা আমরা পরে করিব। তবে এইটুকু বলিয়া রাখি —গোবর গণেশ চাবুক মারিয়াছে অনেককে, ভ্রূকুটি করিয়াছে অনেকের প্রতি। কিন্তু সে ভ্রূকুটিতে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ নাই। এইটুকুই গোবর গণেশের মুন্সীয়ানা। সেইজন্য বলিতে হয়, 'গোবর গণেশ' বাংলা সাহিত্যে অতুল সম্পদ। বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে আমরা 'গোবর গণেশ'কে দেখিতে পাইলে সুখী হইব।"

বিক্রমপুর—"বর্ত্তমান সাহিত্য-ক্ষেত্রে এইরূপ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর সরস ও মনোহর অথচ মর্ম্মস্পর্শী ব্যঙ্গপুস্তক এ পর্য্যন্ত একখানাও প্রকাশিত হয় নাই। লেখক প্রকৃত স্বদেশ-প্রাণ ব্যক্তি, তিনি দেশের কথা ভাবেন বোঝেন ও দেশের জন্য প্রকৃতই

তাঁহার প্রাণ কাঁদে, প্রত্যেকটি লাইনেই আমরা তাঁহার পরিচয় পাইয়াছি। আমাদের জাতীয় অধঃপতনের মূল সূত্রটুকু কোথায় তাহা তিনি খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন। * *

"এরূপভাবে গণেশ মহাশয় সমাজের প্রত্যেক ত্রুটি-বিচ্যুতির আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু কোথাও ধৈর্য্যচ্যুতি নাই—ব্যক্তিগত আক্রমণ নাই—ভাষার অপব্যবহার নাই; অতি নিরপেক্ষ ভাবে সমাজের বিষয় আলোচনা করিয়া বাঙ্গালী-মাত্রেরই ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। নির্ভীক ও নিরপেক্ষ সমালোচনা আজকাল বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্র হইতে একরূপ উঠিয়া গিয়াছে! এমতাবস্থায় গোবর গণেশের গবেষণা বাঙ্গালা সাহিত্য-ক্ষেত্রে এক অপূর্ব্ব আমদানী। আমাদের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা প্রথম পরিচ্ছেদটি ভাল লাগিয়াছে। এ অধ্যায়ে ভাবিবার, শিখিবার ও বুঝিবার অনেক আছে।

"ভাষা সরল ও সুন্দর। বুঝিতে মাথা ঘামাইতে হয় না। এ গ্রন্থের বহুল প্রচার একান্ত প্রার্থনীয়। বাঙ্গালা সাহিত্য-রস-রসিক ব্যক্তিমাত্রেরই এই গ্রন্থ পড়া উচিত।"

মূল্য—সিল্ক বাঁধাই ১৲ টাকা।

প্রকাশক—শ্রীবনমালী সেনগুপ্ত,
১৭ নং টালিগঞ্জ রোড, কালিঘাট, কলিকাতা।

প্রকাশক—শ্রীবনমালী সেনগুপ্ত,
১৭ নং টালিগঞ্জ রোড, কালিঘাট, কলিতাতা।

শ্রীযুক্ত হরিদাস হালদার প্রণীত

কর্ম্মের পথে

সামাজিক ও রাজনৈতিক উপন্যাস

(ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মা—২৬৬ পৃষ্ঠা)

মূল্য—সিল্ক বাঁধাই ১।৷৹ দেড় টাকা।

শ্রীযুক্ত হরিদাস হালদারের

বিবিধ প্রবন্ধ

প্রথম ভাগ (যন্ত্রস্থ)

ইহাতে ছোট-গল্প, বিজ্ঞান-রহস্য ও অন্যান্য লেখা থাকিবে।